সকল কোলাহল একে-একে শেষ হয়ে যায় এমন একটা সময় আসে মানুষের জীবনে, তাকে বলি বার্ধক্য। লগ্নে লগ্নে তখন আর নতুন ক'রে বাঁশী বাজে না, ছুটে-ছুটে আসে না নব-নব তরঙ্গ, শুষ্ক ছিন্নপত্রের দল ধূলোয় লুটোয়,—উড়ে উড়ে বেড়ায় হাওয়ার হাওয়ায়।

আমাদের সোমেশ্বরও এই বয়সে এসে দাঁড়িয়েছেন। যদিচ সোমেশ্বরের চেয়ে বয়সে আমি কিছু ছোট, তবু আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের বাধা ঘটে নি। ঘটবার কথাও নয়। যে-জাতীয় আলাপ আমাদের উভয়ের মধ্যে সাধারণত চলে তা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যেও চলবার উপযোগী। যৌবনে আমরা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিলাম না, পথ ছিল দু'জনের বিভিন্ন, চিন্তাধারাও হয়ত ছিল বিভিন্নমুখী। কিন্তু বার্ধক্যে সবাই একই জায়গায় এসে দাঁড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় একটিমাত্র পরিণাম; সোমেশ্বর আর আমি—আমরা উভয়েই সেই পরিণাম প্রত্যক্ষ করছি।

সোমেশ্বরের পরিচয়টা আমার জানা আছে। পূর্ববঙ্গের একটি জেলায় এঁদের ছিল প্রচুর জমিদারি। আশ্চর্যের বিষয়, এই অর্থনৈতিক দুর্দিনেও তাঁর আয় বেশ স্বচ্ছল। পুরুষানুক্রমে সোমেশ্বরদের 'রাজা' উপাধি। এই পর্যন্ত জানি, এর বেশি জানার ব্যগ্রতা আমার নেই। জমিদারের ছেলের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানবার বিশেষ কিছু থাকেও না। হাতে প্রচুর অর্থ ও প্রচুরতর অবকাশ—অতএব সেই একই গল্পের পুনরাবৃত্তি।

আমরা—অর্থাৎ বৃদ্ধরা চঞ্চল নই। সব কাজ প্রায় ফুরিয়েছে, সময়ও সংক্ষিপ্ত। যেটুকু সময় হাতে আছে সেটুকু গীতা আর গড়গড়াতেই যাবে কেটে। কাটেও তাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গোড়াকার কারণটা ভাবি, ভাবি শীঘ্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো এই দেহটা ত্যাগ ক'রে আবার নবকলেবর ধারণপূর্বক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে। মা ফলেষু কদাচন। যাক্, অনেক কষ্টে যৌবন বয়সটাকে অতিক্রম ক'রে এসেছি। ওই বয়সে কোথা দিয়ে যে এক একটা সমস্যা এসে জোটে ভেবে পাইনে, অনেক দুঃখ দিয়েছে

যা হোক,—এখন নদী স্তিমিত, তরঙ্গহীন। চোখ বুজে অতীত কালটাকে দেখি। সোমেশ্বর সেদিন বলছিলেন, অভিজ্ঞতার ইতিহাস হচ্ছে বোকামির ইতিবৃত্ত।

সমস্ত দিন কাটে। কাটে না বিকাল, কাটে না সন্ধ্যা। কেন কাটে না বলা কঠিন। তখন ভাবি সোমেশ্বর ছাড়া আমার আর মনের মানুষ নেই। ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলবার ধৈর্য থাকে না। তারা আমাদেরই অনুগামী, আমাদেরই অনুকরণ। তারা প্রাচীন উপন্যাসের আধুনিক পুনর্মুদ্রণ। পুরোনো কথাটা ঘুরিয়ে বলতে গিয়ে তারা নিজেদের জটিল ক'রে তোলে।

ভাল লাগে তাই গিয়ে বসি সোমেশ্বরের কাছে। প্রাচীন বনেদী আসবাবে তাঁর বৈঠকখানাটি সজ্জিত, অনেকটা নবাবী আমলের সাক্ষ্য দেয়। ঘরের মেঝেটা কার্পেট করা। সেদিন গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, আজ এত সকাল-সকাল যে!

চুল পাকা ইস্তক স্পষ্ট কথা বলতে শিখেছি। বললাম, ভাল লাগল না বাড়ীতে।

—কেন?

—তোমার ওই গড়গড়াটার মোহ। গীতায় ভগবান বলেছেন, আসক্তি থেকে বন্ধন। আর তা ছাড়া কি জানো, তোমার মুখে গল্প শোনারো একটা চাপা লোভ রয়েছে।

সোমেশ্বর বললেন, ভালো কথা, তোমার জন্যে একখানা বাংলা গল্পের বই সংগ্রহ ক'রে রেখেছি—

বললাম, ক্ষমা করো সোমেশ্বর, মহাভারত পড়ার পর থেকে আমি ফিক্শন্ পড়া ত্যাগ করেছি। এই আজকেই পড়ছিলুম একখানা মাসিক পত্র। একজন নামজাদা লেখক একটা প্রেমের গল্প লিখে যাচ্ছেন। হিসেব ক'রে দেখলুম তাঁর কথাবার্তার মধ্যে সাতচল্লিশবার 'কিন্তু' শব্দটার

ব্যবহার—থাক্ বাংলা আর পড়ব না সোমেশ্বর। প্রেমের গল্প বলতে এত 'কিন্তু' অসহ্য!

আমার উত্তেজনায় কোনো সাড়া পাওয়া গেল না সোমেশ্বরের কাছে। কোনদিনই সাড়া পাইনে। তাঁর প্রশান্ত মুখের প্রসন্নতা কোনো উদ্বেগেই বিচলিত হয় না। ঘরের মাঝখানে ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ডে জ্বলছে মোমবাতি। তার মৃদু আলোয় দেখলাম তিনি চোখ বুজে আছেন। এটি তাঁর অভ্যাস ; অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনায় তিনি চোখ খুলে থাকেন না, চোখে তাঁর নিদ্রা আসে। আমাকেও চোখ বুজতে হোলো।

তাঁর গলার স্বর শুনে পুনরায় চোখ খুললাম। দেখি ইতিমধ্যে চাকর এসে তাঁর সুমুখের টেবলে প্রায় আধ গ্লাস হুইস্কি রেখে গেছে, পাশে একটা সোডার বোতল। সোমেশ্বর যথারীতি গ্লাসে সোডার জল ঢাললেন এবং যথারীতি শতকরা নব্বইজন জমিদারপুত্রের ন্যায় সেবন করলেন। তাঁর ধারণা আমি ওসব স্পর্শ করিনে। আমার সম্বন্ধে অনেক প্রকার অদ্ভুত ধারণা আছে লোকের মনে।

মদ্যপানের পর সোমেশ্বরের প্রত্যহই ঘটে ভাবস্থিতি। বাস্তবিক, এমন সুধীর ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। তিনি মৃদুকণ্ঠে বললেন, সত্যিই বলেছ তুমি, প্রেমের চিত্র আঁকা বড় কঠিন। এই ব'লে তিনি চুপ করলেন।

আর বেশি দূর অগ্রসর না হলেই ভাল হয়। প্রেম কথাটা তুলতে বৃদ্ধ বয়সে মনে লজ্জা আসে। ও-বস্তু আমাদের দ্বারা ইতিমধ্যেই চর্বিত, অতএব ওটার চর্বণের ভার এখন ছেলে-ছোকরাদের উপর। কথাটা আজ না তুললেই ভাল হোতো। ছেলেমানুষীটা ছেলেদের পক্ষেই শোভা পায়। আমি তরুণ নই।

প্রাচীনকাল থেকে, বুঝেছ—সোমেশ্বর চোখ খুলে বলতে লাগলেন, প্রাচীনকাল থেকে ভালবাসার কয়েকটা বহু পরীক্ষিত প্রিন্‌সিপল্ মানুষের

মনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সকল প্রেমের যাচাই হয় সেই কষ্টি-পাথরে।

সোমেশ্বরের ভূমিকায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। এ-সব আমি যে পছন্দ করিনে তা তিনিও জানেন। মনের মধ্যে আমার ভূমিকম্প হতে লাগল। পুরুষের শেষ বয়স কাটে অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে, মেয়েদের শেষ বয়স কাটে ধর্মচর্চা ও পরনিন্দায়। জীবনের সকল স্তরগুলি আমি ও সোমেশ্বর একে-একে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি আর সহ্য হবে না। এখন বুঝতে শিখেছি মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তার কারণ, আমরা ফুরিয়ে গেছি।

সোমেশ্বর বললেন, আজ তোমাকে একটা গল্প শোনাবো।

—কী গল্প?

গল্পটা আমার যৌবন-কালের। ব'লে তিনি পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

যা ভেবেছিলুম তাই। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে আজ সাপ বেরুল। প্রেমের গল্প ছাড়া যৌবনে আর গল্প নেই। মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে আমাদের দেশে প্রেমের গল্প ও উপন্যাস খানিকটা পাঠযোগ্য হবে, অন্তত এখনকার মতো মাসিকপত্রের পাতা উল্টাতে তখন আর ভয় করবে না। তার কারণ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ছেলে মেয়ের সহশিক্ষা প্রবর্তন করার চেষ্টা চলছে। স্ত্রী-পুরুষের মন খানিকটা বিশুদ্ধ হবে, আত্মজ্ঞান জাগবে। সেদিন সোমেশ্বর বলছিলেন, অদূরকালে বিদ্যালয়গুলির বহির্মুখী রূপটা হবে শিক্ষাকেন্দ্র, অন্তর্মুখী রূপটা হবে প্রজাপতি-সঙ্ঘ। তরুণ গল্প লিখিয়েদের সেদিন বিশেষ সুদিন।

প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে সোমেশ্বর বললেন, গ্রাম ছেড়ে আমি তখন প্রথম শহরে এসেছি। এক দরিদ্র গৃহস্থের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘট্‌ল। কেমন ক'রে ঘট্‌ল তার খুঁটিনাটি জানতে চেয়ো না,

ভিতরের তাগিদ থাকলে পথটা সহজ হয়ে যায়। তা ছাড়া কি জানো, অর্থশালী যুবকের সঙ্গে দরিদ্র গৃহস্থরা সোজা পথেই আলাপ ক'রে থাকে।

আবার আমি সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। এর পরে তরুণ জমিদারের যৌবনকালের গল্প কোন্ পথে যাবে তার কিয়দংশ আমি এখনই উপলব্ধি করতে পারি। অন্দর মহলের দিকে লক্ষ্য করলাম, এখনই কেউ হয়ত এসে পড়বে। বৃদ্ধবয়সে আত্মসম্মান ছাড়া আর আমাদের কোনো সম্বল নেই। তাড়াতাড়ি বললাম, থাক্ সোমেশ্বর আজ থাক্—ও আমি বুঝতে পেরেছি। অনেকেরই অনেক কাহিনী চাপা থাকে, সব কথা প্রকাশ করতে নেই। ছেলেপুলেরা রয়েছে ভেতরে।

সোমেশ্বর হাসলেন, অর্থাৎ কিছু প্রকাশ করতে তিনি ভয় পান না। কিন্তু ভয় আমি পাই। প্রেমের গল্প বলতে যা বুঝি তা প্রেমও নয়, কতকগুলি অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত-ইসারা মাত্র। প্রেম সম্বন্ধে নিরাসক্তিই বার্ধক্যের বিশিষ্ট চেষ্টা। আমি এখন সেই স্তরে। গীতায় ভগবান বলেছেন, মানুষের প্রেম দৈহিক আসক্তিতে আচ্ছন্ন, প্রকৃতির প্রয়োজন সিদ্ধি করার ছলনামাত্র। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি, গীতাপাঠের পূর্বেই গীতার অনেক তত্ত্ব আমার জানা ছিল।

সোমেশ্বর বললেন, তোমার কি শোনবার ইচ্ছে নেই ?

বললাম, আত্মবঞ্চনা করব না, শোনবার খুবই ইচ্ছে। তবে কি জানো, আজ একজন নামজাদা লেখকের একখানা বই পড়ছিলাম। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসল এই কথাটা বলতে গিয়ে ভদ্রলোক একশো পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। বিড়াল ইঁদুর ধরতে কতক্ষণ সময় নেয় সোমেশ্বর ?

ওই সময়টুকু নিয়েই বোধ করি সাহিত্যের কারবার। আমার গল্পটা শোনো, এতে সময়ের অপব্যয় নেই এবং খুবসম্ভব এটা সাহিত্যের বিষয়বস্তুও নয় !

চমক লাগল তাঁর কথার। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যা নয় তাই নিয়ে

গল্প বলাটা এই প্রবীণ বয়সে সোমেশ্বরকে পেয়ে বসল কেন? একি হুইস্কির গুণ? কিন্তু নেশা ত তাঁর হয়নি?

চাকর একবার এসে গড়গড়াটা দিয়ে গেল, আমি নলটা ধরলাম।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন; ভয় পেয়ো না, শোনো। যদি কোথাও অশ্লীলতার গন্ধ থাকে জোরে জোরে তামাক টেনো, কিন্তু প্রকাশ করতে বাধা দিয়ো না। গীতায় বলেছেন, নিগ্রহের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পথে বিচারের দ্বারা সংযম লাভ হয়।

মানুষের চরিত্রের নিম্নস্তরে কতকগুলি প্রবৃত্তি জমা থাকে, আমি তখন তাদেরই তাড়নায় ঘুরছি। এমন দিনে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওই দরিদ্র গৃহস্থ-কন্যা, নাম তার মৃণাল। প্রচুর ঐশ্চর্যে ভরা তার দেহ, কিন্তু কুরূপা মেয়ে। দুঃখের জীবন, বিবাহের সম্প্রদানের পর বাসর-ঘর থেকে স্বামীটা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আর ফেরেনি। কুশণ্ডিকার সিঁদুর ওঠেনি মাথায়, বিবাহিত মেয়ে কুমারীই রয়ে গেল। একদিন মৃণাল বললে, তিনি পালিয়ে গেলেন কেন জানো?

—কেন?

—আমার কদাকার চেহারা দেখে। ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান তিনি, তাঁর রুচি আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে। তাঁকে আমি এখনো শ্রদ্ধা করি।

আমি চুপ করে যেতুম। এখনকার মতো তখন স্ত্রী-পুরুষের এতটা স্বাধীনতা ছিল না, আমার পাল্‌কি-গাড়ীতে মৃণালকে নিয়ে সহরের প্রান্তে চলে যেতুম। একা দুটি তরুণ তরুণী, কিন্তু আশ্চর্য, প্রকৃতির খেলা ছিলনা আমাদের মধ্যে। আমি অর্থশালী যুবক, পুরুষানুক্রমে একটু উচ্ছৃঙ্খল, অথচ এই মেয়েটির কাছে এলে আমার পরিবর্তন ঘট্‌ত। পুরুষের লালসার যে-যে লক্ষণ তোমার জানা আছে তা আমার মধ্যে প্রকাশ পেত না। সে কুরূপা, কদাকার, কিন্তু তার সুস্থ সরল দেহের এমন অসামান্য ঐশ্বর্য

ছিল যে, আমার প্রবৃত্তিতে কিছুতেই আট্‌কাতো না। একদা সে বললে, তুমি রাত ক'রে বাড়ী ফেরো কেন?

কোন অধিকার তার নেই, তবু এই প্রশ্ন। বললুম, অনেক কাজ থাকে বাইরে।

—কী কাজ এত ?

—এই ধরো বন্ধুবান্ধব, বেড়ানো, গান-বাজনা—

—রাতে কি করো ?

—পড়াশুনো করি।

মৃণাল বললে, বেশি রাত জেগো না, দয়া ক'রে আমার অনুরোধটা মনে রেখো। অনেক রাতে খেয়োনা।

এমন কথা শুনিনি কোন দিন। আমার চারিপাশের পরিচিত যারা, আমার এদিকটায় তারা ভ্রূক্ষেপ করে না, আমার মনের নিভৃত অন্দরমহলে তাদের প্রবেশ নেই, তারা সদরমহলের অতিথি-অভ্যাগত। কিন্তু এ মেয়েটি সোজা চলে আসে আমার অন্তরের মণিকোঠায়, আমার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কুণ্ঠিত হ'য়ে মাথা নত করে। তখন বুঝি আমার শরীরের দাম আছে, আমার বাঁচার অর্থ আছে, এমন কি সবচেয়ে যেটা বিস্ময়কর, আমি ভাবি, মৃণালের কাছে বসে মনের কথা বলার প্রয়োজন আছে আমার।

একদিন বললুম, তোমাকে আমি ভালবাসি মৃণাল।

মৃণাল শরাহত পাখীর মতো শঙ্কিত চোখে আমার প্রতি তাকাল, বললে, ক'দিন থেকে ভাবছিলুম এই কথাটাই তুমি আমাকে শোনাবে। নিজের কাছে তুমি সত্যি হও, সোমেশ্বর।

—আমি কি ভালোবাসিনে ?

অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে মৃণাল চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলো, তারপর বললে, এসব ছাড়ো, অন্য কথা হোক। বলে সে একটু স'রে বসল।

আমাকে তার দেহের কাছ থেকে সরিয়ে রাখাই তার সকলের চেয়ে বড় কাজ।

কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণাল বললে, আমি কি ভাবি জানো, আমার ইচ্ছে করে সারাদিন ধরে দেখি কেমন ক'রে তোমার দিন কাটে। রাত্রে তুমি খোলা জায়গায় শোও না ত? ঠাণ্ডা লেগে যদি তোমার অসুখ করে তাহলে আমি দেখতে যেতে পারব না, জানো ত? লোকে তোমায় মন্দ বলবে!

অত্যন্ত গ্রাম্য ভালবাসা। এ ভালবাসা বুদ্ধিতে উজ্জ্বল নয়, পাণ্ডিত্যে গভীর নয়, কবিত্বে হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টাও নেই। যে সমাজটায় আমার আনাগোনা সেটার নাম শিক্ষিত সমাজ, পালিশ করা সভ্যতায় সেটা চক্‌চকে। সেখানে বহু সুন্দরী রমণী, তাদের চোখে আমি আদর্শ যুবক; আমি তাদের লোভের বস্তু এ-ও জানি, তাদের যথাযোগ্য মূল্যও দিয়ে থাকি। কিন্তু মৃণালের আবহাওয়ায় এমন একটি অত্যাশ্চর্য প্রশান্তি যে আমি একটি অনির্বচনীর আধ্যাত্মিকতার গভীরে তলিয়ে যাই, সেটি আমার সত্য পরিচয়। কী আছে তার? দেহ? আমি জানি আমার চারিদিকে সহজলভ্য সুন্দর দেহ অনেকগুলি রয়েছে। পুরুষের কামনা অনেক বড়, তারা রূপের ভিতর দিয়ে চায় রূপাতীতকে, দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতকে।—বলে সোমেশ্বর চোখ বুজলেন।

আমি বললাম, বেশ ত এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন, সংসারে এমন উচ্চস্তরের ভালোবাসা আছে বৈকি। কুরূপা মেয়েরা সাধারণত সচেতন, স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক গোপন দম্ভ তাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে কম থাকে।

কম?—সোমেশ্বর চোখ চেয়ে বললেন, একদিন মৃণালকে কিছু সোনার গহনা উপহার দিতে গেলুম, অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল তার মুখ। স্পষ্ট বললে, আমাকে অপমান ক'রো না সোমেশ্বর, তুমি কিছু দেবার চেষ্টা করলেই আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে, কারণ, তুমি যে বড়লোক, টাকায় তোমরা মনুষ্যত্ব মেপে নাও। ওসব তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি

ভালোও বেসো না, দিতেও কিছু এসো না, এই অনুরোধটা রেখো। তুমি কিছু দিতে এলেই ভাবি সেইসঙ্গে আমাকেও তুমি ফিরিয়ে দিলে।—সোমেশ্বর নীরব হয়ে গেলেন।

বললাম, অনেক কুমারী মেয়ে আছে যারা হেঁয়ালী পছন্দ করে বেশী। পুরুষের সংসর্গ না পেয়ে তারা নিজেদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এই সব মেয়েরাই একদিন প্লাবনে ভেসে যায়।

সোমেশ্বর বলললেন, বলো, যা কিছু তোমার সত্যি বলে মনে হয় তাই বলো, কিছু বাদ দিয়ো না। আমিও একদিন তোমার মতো নানাদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি মৃণালকে, অনেক দিক দিয়ে আকর্ষণ করেছি তাকে, কিন্তু কোনো বন্ধন সে মানেনি। এতখানি কুরূপা বলেই তার এত বড় অহঙ্কার, এতখানি উপেক্ষিত বলেই এত বড় তার পরিচয়। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গেছি তার কাছে, সে ত রেগেই আগুন! কাছে বসিয়ে আঁচল দিয়ে মাথা মুছিয়ে সে বললে, এমন দুরন্ত তুমি? এই দুর্যোগে কেউ বাইরে বেরোয়? কী ক্ষতি হোতো না এলে?

বললুম, কী বলচ মৃণাল, বর্ষা-বাদলে যে মনে পড়ে তোমাকে! মিষ্টার ডাটের বাড়ীর মেয়েরা নেমন্তন্ন করেছিলেন জলবৃষ্টি দেখে, তাঁরা চেয়েছিলেন আমাকে বর্ষার গান শোনাতে, সেখানে না গিয়ে এলুম তোমার এখানে, তুমি বলচ এই কথা?

বাইরের বৃষ্টিধারার দিকে চেয়ে মৃণাল বললে, তোমার দিন এমনি ক'রে নষ্ট হয়, তোমাকে বোঝে না কেউ, তোমার যে ওসব ভালো লাগে না তা তারা বুঝতে পারে না।—তারপর চট ক'রে কথা ঘুরিয়ে সে বলতে লাগল, গেলেই ভাল করতে সোমেশ্বর, তোমাকে যারা কাছে চায় তারাও আমার প্রিয়, সত্যি বলছি তোমাকে, তোমার প্রশংসা যারা করে তারা আমার বড় আপন।

সস্নেহে তার গায়ে হাত দিতে গেলুম, সে সরে দাঁড়াল। বললে, ছুঁয়ো

না, তুমি হাত বাড়ালেই ভয় করে : ছুঁলে তুমি ছোট হয়ে যাবে, তুমি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলেই আমার কান্না পায়।—হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গ্লাসটায় সোমেশ্বর শেষ চুমুক দিলেন।

আমি বললাম, বুড়ো হয়েছি কিন্তু যুবককালে এমন ভালবাসার গল্প কাব্যে-সাহিত্যে পড়েছি বৈ কি। সেদিন এসব ভালোও লাগত। আশ্চর্য !— গড়গড়ার পাইপটা টানতে লাগলাম।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, দুর্যোগের দিনে দেখা হলেই ধমক খেতুম। প্রকৃতির চেহারা ঘনিয়ে এলে শুনেছি নারী তার প্রিয়তমকে কাছে পাবার ব্যাকুলতায় বলে, হরি বিনে কেমন ক'রে কাটবে আমার এমন দিন ; অভিসারিকার বেশে সেই চিরন্তনী নারী ছুটে যায় পথে ঘোর নিশীথ রাত্রে, কিন্তু এখানে সেই লোকোত্তর প্রেমের আকুলতা নেই ! অত্যন্ত স্পষ্টকণ্ঠে মৃণাল বললে, বেরিয়ো না তুমি এমন দিনে, জল পড়বে মাথায়, ঝড় লাগবে গায়ে—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। সোমেশ্বর, আমার কথা শোনো, তোমার ভালো হবে।

তার কথা শুনলে আমার ভালো হবে এই ছিল তার ধারণা। একটি গভীর কল্যাণ-বুদ্ধি ছিল তার আমার সম্বন্ধে ; শুধু আমার শরীর নয়, আমার মনকে নির্মল রাখাও ছিল তার বড় কাজ।

আমার সম্বন্ধে মনে-মনে বিশ্রী কিছু ভাবো না ত ?—মৃণালের এই কথাটা শুনে আমি অবাক হতুম। বলতুম, কী ভাববো বল ত ?

পুরুষে যা ভাবে। দোহাই তোমার, আমার কাছ থেকে গিয়েই আমার কথা তুমি ভুলে যেয়ো !

এমন কথা কেন বলচ মৃণাল ?

কিছু মনে করো না, তোমার যে শরীর খারাপ হবে, তোমার মন যে ঘুলিয়ে উঠবে !

একদিন বললে, এই যে তুমি চলে যাও আমার কাছ থেকে, আমার মন

যায় তোমার পিছু-পিছু ; সারাদিন তোমার সব কাজকর্মের পাশে থাকি, সব দেখতে পাই তোমার। ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসি।

অবাক হয়ে যেতুম তার সরল স্বীকারোক্তিতে। এ কি সত্য, একি সম্ভব? ভালবাসা কি একেই বলে? কোনো চাঞ্চল্য নেই, প্রত্যাশা নেই, দান-প্রতিদানের হিসেব-নিকেশ নেই, এমন কি ভাবলে অবাক হই, একটু কোথাও উচ্ছ্বাস পর্যন্ত খুঁজে পাইনে, এমন প্রশান্ত চেহারা এর? আমাদের কাছে জ্যোৎস্না রাত অর্থহীন, দক্ষিণ বাতাস ব্যর্থ, ফুলের গন্ধ, প্রকৃতির শোভা, মেঘ-মেদুর আকাশ—এরা নিতান্তই হাস্যকর, এমন সুস্পষ্ট ভালোবাসার চেহারা আমি আর কোথাও দেখিনি। এই কুরূপা কদাকার মেয়েটার জন্যে আমি ছাড়লুম বন্ধু-বান্ধব, সামাজিকতা, আমোদ-আহ্লাদ, অথচ আমার চারিদিকে এরা প্রচুর ছিল। আমি বিলাসী ধনাঢ্য যুবক, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগের সামগ্রী ছিল আমার সকল দিকে। আসক্তিকে নষ্ট করাই কি ভালবাসার সকলের চেয়ে বড় কাজ?

একদিন বললুম, তুমি এই যে আমার সঙ্গে বেড়াও মৃণাল, লোকে ত তোমায় নানা কথা বলতে পারে।

মৃণাল হাসলো। বললে, পারে কিন্তু বলে না।

বলে না, তুমি জানো?

জানি।

তা'হলে তোমাকে তারা এইদিকে প্রশ্রয় দেয় বলো?

মৃণাল আবার হাসলো,—যারা প্রশ্রয় দিতে পারে কলঙ্কও রটাতে পারে তারা। কিন্তু সবাই জানে, খুব ভালো করেই জানে, আমার দ্বারা কলঙ্কের কাজ হয়ে উঠবে না।

তবু তারা ত আর ঘাস খায় না মৃণাল, বুঝতে পারে সব।

ঘাস যারা খায় না তারা আমাকে বিশ্বাস করে সোমেশ্বর। আমার কিন্তু বিশ্বাসের মূল্য দেবার চেষ্টা নেই। মানুষকে আমি ভয় করিনে।

আমি বললুম, তুমি জানো আমার চরিত্র কেমন ? জানো আমি তোমার এই ভালোবাসার যোগ্য নই ?

কেন ?—মৃণাল মুখ তুললো।

সেদিন আমি প্রস্তুত ছিলুম। বললুম, তুমি কি জানতে পেরেছ আমি সচ্চরিত্র নই ?

জানতে চাইনে।

তবু জানতে তোমাকে হবে।—আমি চেপে বসলুম তার কাছে। আমি বলতে আরম্ভ করলুম, সে নিঃশব্দে চিন্তিত মুখে শুনে যেতে লাগল। সমস্ত সন্ধ্যাটা ধরে বললুম, আমার দীর্ঘকালের স্খলন-পতনের কাহিনী। এমন অকপটে কথা আমি আর কাকেও বলিনি। আমার নিকটতম বন্ধুর কাছেও যে সব কথা বলতে বাধতো, তাও আমি অসঙ্কোচে প্রকাশ করে দিলুম। মৃণাল কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আমি যেন তাকে শরবিদ্ধ করেছি, তার পাঁজর ভেঙে দিয়েছি, তাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছি। সেদিন ফেরবার পথে আসতে আসতে ভাবলুম, যাক্ বাঁচা গেল ; আমি মুক্ত, মৃণালকে আমি মুক্তি দিতে পেরেছি, মোহ ভেঙে গেছে। ভূমিকম্পে তার প্রাসাদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, এবার যাক সে নিজের পথে। বাঁচলুম।

কয়েকদিন পরে আবার দেখি সে খবর পাঠাল। গেলাম। আমাকে দেখেই যেন তার মুখের উপরে আলো জ্বলে উঠল।

শরীর ভাল ছিল ত ? রাত জেগে পড়াশুনো বন্ধ করেছ ?

বললুম, আবার যে ডাকলে ?

ওমা, ডাকব না কেন ? এসো। শীতের দিন, গরম জামা পরোনি কেন ?

আমি তাকে চুম্বন করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম।

মৃণাল গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, অমন করে চেয়ো না সোমেশ্বর,

নির্ভয়ে আমাকে কাছে বসতে দাও।—কাছে বসে সে বললে, মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে আমার ভয় করে। তুমি কখনো দস্যু, কখনো বন্ধু। দেহ নিয়ে টানাটানির মানে কী জানো, নিজেদের ধ্বংস করা। যারা সংযত তারাই বুদ্ধিমান।—সোমেশ্বর আবার চোখ বুজলেন।

চাকর এসে গড়গড়ার কল্‌কেটা বদলে দিয়ে গেল। রাত ঘনিয়ে এসেছে। নতুন করে তামাক টানতে টানতে বললাম, অনেক মেয়ে আর অনেক ছেলে এমন হয় দেখেছি। মেয়েরা তাত্ত্বিক হয় পুরুষ-সংসর্গের ঠিক আগে, পুরুষরা তাত্ত্বিক হয় নারী-সংসর্গের ঠিক পরে। মেয়েদের চরিত্রের মাধুর্য পাওয়া যায় কুমারী অবস্থায়, পুরুষের চরিত্রের ঐশ্বর্য পাই তাদের বিবাহের পরে। তোমার মৃণালের ধরণ একটু আলাদা। মনে পড়ে চুল পাকবার ঠিক আগে একটি স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম। সুন্দরী এবং চরিত্রবতী। কিন্তু তার কাজ ছিল আপন রূপ এবং সচ্চরিত্র প্রকাশ করে ছেলেদের কাছে স্বার্থ ও সুবিধা নেওয়া—সে স্বার্থ সময় সময় অত্যন্ত স্থূল এবং সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠত। যৌন বিজ্ঞানে আছে, সেক্‌স্‌-এর য়্যাপীল্‌ দিয়ে মেটিরিয়ল্‌ য়্যাডভাণ্টেজ আদায় করা। তোমার মৃণাল অবশ্য একটু সুপীরিয়র এলিমেণ্ট। কিন্তু তুমি মনে করো না, তোমার এ ভালবাসা দেহহীন ; দেহ আছে, কিন্তু এ প্রেম খানিকটা যৌন-রহিত। বস্তুর চেয়ে গন্ধে বেশি নেশা হয়। ইংরেজিতে বলে, নন্‌-নরম্যাল্‌।

সোমেশ্বর হেসে চোখ খুললেন। বললেন, তোমার মতো একদিন আমিও বুদ্ধি ও বিজ্ঞান দিয়ে মৃণালকে বিচার করেছি। কিন্তু তার প্রাণের দিকে নিয়ত আমার দৃষ্টি জেগে থাকত, তার লীলা আছে, ধর্ম আছে। বুদ্ধি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। কথায় জমে ওঠে কথা, প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে, যুক্তির ভারে হৃদয়াবেগের হয় কণ্ঠরোধ। বুদ্ধিতর্কের রাক্ষসীবৃত্তিতে রসতত্ত্বের যজ্ঞ পণ্ড হয়।

একদিন মৃণাল বললে, তোমার ভালোতেই আমার ভালো এটা ভুলো

না সোমেশ্বর! আমি যতদিন বাঁচবো, যেন দেখি তুমি সুস্থ আছো। আর যদি কোনো মেয়ে তোমাকে আনন্দ দেয়, জানবে সে আনন্দ আমার!

সোমেশ্বর উত্তেজিত হয়ে বললেন, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করে, মেয়েরা মরে ত জায়গা ছেড়ে দেয় না,—এত বড় অন্যায় ধারণা আর নেই। আজ তুমি যে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের গল্পটা পড়ছিলে সেটাও ওই পাঠক ভোলানো সস্তা রঙীন প্রেম, চুড়ির আওয়াজ আর আঁচলের খুঁট নিয়ে চিত্তবিলাস, মনস্তত্ত্বের জটিল গ্রন্থী নিয়ে টানাটানি, অধস্তন প্রবৃত্তির গায়ে কলম ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া। কথন-ভঙ্গীকে হৃদয়গ্রাহী করে বক্তব্যের দৈন্যকে চাপা দিলেই জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হওয়া সহজ হয়।

উত্যক্ত হয়ে বললাম, যাক্, গল্পের মাঝপথে তর্কের ঝুলি এলিয়ে বসো না, বলো।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, ভালোবাসার কতকগুলি মহত্তর নীতি আছে। সর্বজ্ঞানীদের বিচার বুদ্ধিতে সেই নীতিগুলি চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত, মৃণালের প্রাণের ভিতরেও সেই নীতিবোধ ; এ তার সহজাত। সে আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে একদিন বলেছিল, আমাকে পেয়ে তার পরম আত্মোপলব্ধি ঘটেছে—যেমন অপরিচিত ভ্রমরের পদরেণুতে নিভৃত নীলপদ্মের আত্মপ্রকাশ।

বুড়ো হয়েছি. কাব্য আর সহ্য হয় না। ছোকরা বয়স হলে সোমেশ্বরের উচ্ছ্বাসটা বিরক্তিকর মনে হতো না। কিন্তু কী করা যাবে, রূপার গড়গড়ায় অম্বরী তামাক সে খেতে দিয়েছে। বেঁধে মারে, সয় ভালো। বৃদ্ধ বয়সে সোজা কথাটা সহজ করে বুঝতে অভ্যাস করেছি, সকল প্রেমই এক সময়ে শেষ হয় সৃষ্টিতত্ত্বে, প্রকৃতির নানা ছলনা, নীলপদ্ম অথবা রক্তজবার উপমায় তাকে ভোলানো কঠিন। নির্বোধ নরনারীর মনে মায়া বিস্তার ক'রে সে আপন খেয়ালে তাদের চালিত করছে।

সোমেশ্বর বললেন, একবার তাকে না বলে এক বন্ধুর সঙ্গে বিদেশে

রওনা হয়েছিলুম। পথের নানা কষ্টে রোগ নিয়ে ফিরলুম দেশে। দেখেই ত মৃণালের চক্ষু স্থির। বললে—উন্মাদিনীর মতো উচ্চকণ্ঠে বললে, আমি জানি যে তোমার এমন হবে, আমি যে সেদিন স্বপ্ন দেখলুম! মানৎ ক'রে রেখেছি মহাকালীর কাছে। আমার অবাধ্য হলে বিপদে তুমি পড়বেই সোমেশ্বর, তোমার সকল বিপদ আমি আড়াল ক'রে থাকি। নিশ্চয় তোমার সেই বন্ধু পথে তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল!

কিছু দিয়েছিল বটে মৃণাল।

তা ত দেবেই; আমার কাছ থেকে যে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় সে কখনো তোমার বন্ধু নয়। জীবনে তুমি দুর্নীতির রসদ যুগিয়েছ যাদের, তারাই কষ্ট দেবে তোমাকে, তাদের কাছে থেকেই আসবে শত্রুতা। পাপকে বাঁচিয়ে রাখলে সেই পাপই একদিন দুঃখ দেয়। আমার কি হয়েছিল জানো সোমেশ্বর?

কি হয়েছিল মৃণাল?—আমি অবাক হয়ে চেয়েছিলুম তার দিকে।

তুমি—তুমি চলে গেলেই আমি ভাবি অন্য কথা। তুমি দূরে গেলেই পুতুলের মতো ছোট হয়ে যাও। এত ছোট যে একটি শিশুর মতন, সন্তানের মতন—ইচ্ছে করে আঁচলের আড়ালে ঢেকে পথটা তোমায় পার ক'রে দিয়ে আসি, তোমার গায়ে যেন বিপদের আঁচড়টি না লাগে।—চেয়ে দেখলুম এক প্রকার অস্বাভাবিক আবেগে মৃণালের সর্বশরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এমন জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি, সত্যিই তোমায় বলছি, আমি আর দেখিনি।

ভূতে পেলে এমন হয়।

সোমেশ্বর হেসে বললেন, সেদিনের কথাটাও তোমায় বলব। বিলাস-ব্যসনের জীবন হলেও আমার মধ্যে কোথায় একটা দুঃসহ দারিদ্র্য ছিল। একদিন কি কারণে কোথায় যেন অত্যন্ত অপমানিত হয়েছিলুম। কোথায় ছুটব সান্ত্বনার জন্য! গেলুম মৃণালের ওখানে। চোখ দিয়ে আমার

ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ছিল। সেইদিন—কেবল সেইদিনটির জন্য মৃণাল ভুলে গিয়েছিল তার চারপাশের জনসমাজ, ভুলে গেল তার আত্মীয় স্বজন, গুরুজনদের কথা। সকলের মাঝখান দিয়ে ছুটে এসে সে আমার হাত ধরে বললে, কি হয়েছে সোমেশ্বর?

একলা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। কাছে বসিয়ে মাথাটা টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে বললে, কোথায় লাগল?

তা বলতে পাচ্ছিনে মৃণাল!

বলতে পারছ না, তবে বুঝি বুকের ভেতরে লেগেছে? বড় পরিশ্রম করেছ, নয়? আজ আর তোমায় ছেড়ে দেবো না, এমনি ক'রে শুয়ে থাকো সারারাত!

গলার আওয়াজ তার কাঁপছে। কান্নায় কাঁপছে তার মন, তার প্রাণ। একে বলব ভালোবাসা। মানুষের ভিতর দিয়ে ভালবাসছে সে মানবাতীত দেবত্বকে, দুর্লভকে চাওয়াটাই প্রেম। সেদিন একবারটি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার গলার আওয়াজ। বললে, না, তুমি থেকো না, তুমি যাও। কোথায় এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে রাখবো তোমায়? বুকের মধ্যে কোথায় তোমার কাঁটা ফুটেছে, কেমন করে খুঁজবো! তুমি ঝড়, ওলট-পালোট করতে এসেছিলে, এবার যাও—যাও।

ঝরঝরিয়ে মৃণালের চোখের জল পড়ল।

আসবার আগে বললুম, তোমাকে বিয়ে করব মৃণাল।

বিয়ে করবে? আমাকে?

তোমাকে। মৃণালকে।

ছি সোমেশ্বর।—স্থির কণ্ঠে মৃণাল বললে, এমন কথা আর বোলো না। যারা কুরূপ তারা কমে যাক্ সংসার থেকে, তাদের সংখ্যা আর বাড়িয়ো না। তারা পাপী।

কী বলছ মৃণাল?

বলছি বিয়ে আমি করব না। পারব না আমি কুশ্রী সন্তানদের লালন-পালন করতে। আমার রুচি আছে, আমি রূপের ভক্ত। তুমি রূপবান, তোমার বংশধারাকে মলিন করবার অধিকার আমার নেই সোমেশ্বর।

বুদ্ধি আর জ্ঞানে উজ্জ্বল যে ভালোবাসা—সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, তাই আমি পেয়েছিলুম মৃণালের কাছে। তত্ত্ব নয়, মনস্তত্ত্বও নয়—তার বিচারের রীতি তরবারির মতো উজ্জ্বল। নাটক নভেলের প্রেম হচ্ছে আত্মবঞ্চনার বিশ্লেষণ। মৃণালের হৃদয়ের প্রথম স্তরে ছিল মাতৃমূর্তি, প্রশান্ত দুটি রূপ। একটির সঙ্গে আরেকটির অপূর্ব সামঞ্জস্য। যা দিলে তা সর্বকূলপ্লাবী, রিক্ত ক'রে দিলে, প্রতিদানে নেবার কিছু ছিল না তার, যা দেবো তাই তার কাছে সামান্য, অকিঞ্চিৎকর।

এই চেহারা ভালোবাসার। অশ্রুর বিলাস নয়, সমাজের কচকচি নয়, কোনো উচ্ছ্বাস আবেগ নেই, মান অভিমানের লোভনীয় অভিনয় করেনি, আলোছায়ার লীলা ছিল না, তার ভিতর দিয়ে আমি আমার সর্বোত্তম মনুষ্যত্বকে অনুভব করেছি।—সোমেশ্বর চোখ বুজলেন।

কতকাল গেল তার পরে।—চোখ বুজেই তিনি পুনরায় সুরু করলেন, ক'বছর তা আর মনে নেই, স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসারে মন দিয়েছি, টাক্ পড়েছে মাথায়। আমার স্ত্রী ছিলেন মৃণালের বড় প্রিয়, বড় আত্মীয়। কিন্তু আমার বিয়ের পর থেকেই মৃণাল দেশ ছেড়েছিল, স্ত্রীর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে। মানা করেছিল, তাকে যেন না খুঁজি। খুঁজিওনি তাকে।

আমি এইবার বললাম, খোঁজনি কেন?

কেন?—সোমেশ্বর বললেন, খুঁজবো তাকে মনে, খুঁজবো প্রাণ দিয়ে। ভগবৎ গীতার মতো সে মধুর, যখনই ভাবি তখনই নতুন অর্থ পাই, নতুন ক'রে চোখ খুলে যায় দিকে-দিকে।

তারপর ?

তারপর এই জীবনে কেবলমাত্র আর পাঁচ মিনিটের জন্য তার দেখা পেয়েছিলুম। দেখা না পেলেও কিছু এসে যেত না। কমলেশ্বর তীর্থের পথে দেখা মৃণালের সঙ্গে, চম্পারণের এক রেলওয়ে স্টেশনের ধারে। বাউলের বেশে গান গেয়ে-গেয়ে ভিক্ষা ক'রে ফিরছে। জীর্ণ মলিন বেশ, বিগতযৌবনা, তার কুরূপ আরও কিছু কদাকার হয়ে উঠেছে,—ধনাঢ্য এবং সুপুরুষ 'রাজপুত্র' আমি সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। কেমন একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হোলো সেদিন তার পায়ের ধূলো নিতে। বেশি কথা হবার অবকাশ ছিল না। তু'জনের মাঝখানে যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁক, কাল-কালান্ত ধ'রে ছুটলেও তাকে ধরা কঠিন। আশ্চর্য, আমার কুশল সে আর জিজ্ঞাসা করলে না, আমার সম্বন্ধে আর তার উদ্বেগ নেই, ভাল ক'রে লক্ষ্যও করলে না আমাকে। আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারলেই সে যেন খুশী হয়। তার পথে বাধা দিয়ে বললুম, কি জন্যে তুমি এমন ক'রে সর্বস্বান্ত করলে নিজেকে মৃণাল ?

আমার কম্পিত উদ্বেলিতকণ্ঠে তার মুখে হাসি ফুটল, তপোবনের ঋষিকন্যার মতো জ্যোতিষ্মান হাসি তার। সোহাগের সুরে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, সর্বস্বান্ত হয়ে সর্বস্বকে পেয়েছি সোমেশ্বর।

চমকে উঠলুম। বললুম, কে সে ? তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না মৃণাল ?

না।

তবে ?

যাঁকে ভালোবাসি তিনি আছেন আমার মনে।—বুকে হাত রেখে মৃণাল বললে, তাঁর পথ আমার মহাপ্রাণের মহাবৃন্দাবনে, আমি কোনোদিন কারুকেই ভালোবাসিনি সেমেশ্বর।

সে কি, বঞ্চনা ক'রে এসেছ আমাকে এতকাল ?

না, আমাদের মিলনের তুমিই ছিলে দূত !—

হেসে সে আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিলে। তারপর বললে, ঠাকুর কিছু ভিক্ষা দেবে গরীবকে ?

দিলুম না ভিক্ষে, দেবার সাধ্য ছিল না, শক্তি ছিল না, কেবল আমার স্তম্ভিত দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে দেখলুম, মৃণাল চলে গেল হেসে-হেসে, বাউলের একটা গানের ধূয়ো ধরে' হেলে-দুলে। সে যেন পরম প্রেমিককে পেয়ে গেছে সখ্যভাবের মাধুর্য দিয়ে।

গল্পটা শেষ হতেই মুক্তির নিশ্বাস পড়ল। মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলুম, কেউ শুনতে পায় নি ত ? চুল পেকেছে সুতরাং এখন আর গল্পের রসবস্তুর দিকে মন থাকে না, এখন দেখি কোথায় এর অশ্লীল ইঙ্গিত ফুটে উঠছে। চুল পেকেছে কিনা, তাই মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।

যাক ধন্যবাদ সোমেশ্বরকে। তাঁর গল্প বেশ ঝরঝরে, ভাষা প্রাঞ্জল, বলবার ভঙ্গী সংযত। এইবার তিনি হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিয়ে বাকিটুকু শেষ ক'রে আবার ধ্যানস্থ হলেন। বাঁচলেম, কোনক্রমে বিদায় নিয়ে আজকের মতো পালাতে পারলেই বাঁচি। দুইজন বৃদ্ধ সুরাপাত্র সম্মুখে রেখে একত্রে বসে যৌবনকালের একটা ভালোবাসার গল্প ফেঁদেছেন, এর চেয়ে অসঙ্গত এবং অশোভন আর কী হতে পারে। সায়াহ্নকালের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি পারের খেয়া-নৌকার আশায়, ডাক দিয়েছে পারান্তের অবগুণ্ঠিত রহস্যলোক, এই বয়সে ফিরে তাকাব পিছনে ? অনুকরণ করব নির্বোধ যুবজনের ?—আমাদেরই পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত পশ্চাৎ জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ যাদের দম্ভের আর সীমা নেই !

বিদায় নিয়ে সেদিনকার মতো বেরিয়ে এলুম। বাড়ী ফিরতে রাত হোলো। তরুণ নই, মাথার চুল পেকেছে, অতএব বেশি রাতে বাড়ী ফিরলে এখন আর কেউ সন্দেহ করবে না, স্ত্রী ত করবেনই না। কারণ বিগতযৌবনা স্ত্রীদের ধারণা, তাঁদের মতো স্ত্রী না থাকলে আমাদের

মতো পুরুষদের শেয়াল-কুকুরের অবস্থা হোতো, আমরা পথে পথে বেড়াতুম। যাক্, কিন্তু এটা ঠিক, পুরুষ মানুষকে কোনো বয়সেই বিশ্বাস করা অনুচিত, এবং মেয়েদের কোনোকালেই একা থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। এই যেমন বুড়ো বয়সে, কে বুঝবে, এতক্ষণ যৌবনকালসুলভ চপলতা নিয়ে সময় অতিবাহিত করেছি। গীতা পাঠ করি সুতরাং চরিত্র সম্বন্ধে এখন আর কথা তুলবে কে? সোজা এসে নিজের ঘরে ঢুকলুম। এই সংসার, এই পরিবার আমার নিজের সৃষ্টি, আমি জনক, আমি প্রতি-পালক, আমি নায়ক। স্ত্রী আছেন, তিনি নখদন্তহীন বিগতাযৌবনা,—এককালে কিছু জৌলষ ছিল তাঁর অঙ্গে অঙ্গে, এখন সে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বাঁচা গেছে। আপাতত আমি ছাড়া তাঁর দিকে তাকাবার মতো ইহসংসারে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই। কেমন ক'রে থাকবে? স্ত্রীলোকের যত কিছু আদর আপ্যায়ন, যত কিছু খ্যাতি আর অখ্যাতি তার যৌবন বয়সে। তারপর সে বাতিল, সে নিষ্প্রয়োজনীয়, উদ্বৃত্ত। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের স্থান পুরুষ সমাজে নেই, বৃদ্ধ পুরুষের স্থান নেই রসিক সমাজে।

'আমাদের চোখে এই বৃহৎ পৃথিবী তখন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে—' সেদিন সোমেশ্বর বললেন, 'চারিদিকে আর বাঁশী বাজে না, বাজে কেবল একদিকে, তা'তে ছেড়ে চ'লে যাওয়ার সুর।'

আজকে আবার আসর জমবার একটা আভাস আসছে সোমেশ্বরের তরফ থেকে। ভয় পেয়ে বললুম, 'বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-পুরুষের আসক্তির কাহিনী শুনতে আর ভালো লাগে না, তা'কে যতই হৃদয়াবেগের পালিশে চক্‌চকে করো না কেন।'

'ঠিক বলেছ—' সোমেশ্বর বললেন, 'তোমার ওই জনপ্রিয় উপন্যাস লেখকের রচনা পড়ে আমারো এই ধারণা হয়েছে। এই সাহিত্যব্যবসায়ীর গল্পে প্রায়ই দেখা দিত অল্প বয়সের নায়ক নায়িকা। বি-এ ফেল্‌-করা

যুবক আর কেরাণিকুলের স্ত্রীরা তাঁর লেখা প'ড়ে খুব খুশী থাকত। ছন্নছাড়া কয়েকজন স্ত্রীপুরুষের মুখে অসংলগ্ন মনস্তত্ত্ব আওড়ানো তাঁর প্রতিভা ব'লে স্বীকৃত হোলো। কেন হবে না বলো, সময়ের সুযোগ। মেয়েদের আঁচলের তলায় ঘুরে বেড়ানোই তাঁর নায়কের পুরুষত্ব, আপন চরিত্রের ছাপ রাখতে চান্ তিনি নায়কের মধ্যে।'

একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললুম, 'যাঁরা শ্রদ্ধেয়, বয়স্ক, যাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের বিদ্রূপ ক'রো না। পরক্ষোভাবে কা'কে তুমি আক্রমণ করছ বলো ত? কি নাম তাঁর?

'নামটা ফাঁস করব না, তাহলে বাক্‌সংযম করতে হবে। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যক্তিগত। শোনো। হঠাৎ এখন দেখি তাঁর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নায়ক নায়িকার বয়সও বাড়ছে। তোমার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের আজকালকার একটা গল্পে দেখছি নায়িকার বয়স চল্লিশ, উপযুক্ত সন্তানের মা, এবং নায়কের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। মাসিকপত্রে একটু একটু বেরুচ্ছে, বুড়োবুড়ির বেহায়াপনাটা একবার প'ড়ে দেখো, এটা তাঁর প্রব্লেম্ আনার বাহাদুরি।'—সোমেশ্বর নাসা কুঞ্চিত ক'রে পুনরায় বললেন, 'নিজের ইচ্ছাবৃত্তির পুতুল গ'ড়ে যে লেখক গল্পের নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে, তারা লোকপ্রিয় সাহিত্যিক হয়ে বন্দনা লাভ করতে পারে, এ দুর্দিন বুঝতে পারি, কিন্তু সেই কৃতিত্বকে প্রতিভা ব'লো না। মাটির প্রদীপের আলো সূর্যের কিরণ নয়।'

'থাক্ সোমেশ্বর, সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচার ক'রো না, তুমি তরুণ নও। দরিদ্র সাহিত্যিকের অন্নে হাত দিয়ো না।'

হুইস্কির গ্লাস এলো। চারদিকে একবার তাকিয়ে চোখ বুজে সোমেশ্বর বললেন, 'কথা বলতে গেলেই আজকাল আমার মনের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়, তার কারণ হচ্ছে বার্ধক্যের অকর্মণ্যতা এবং অযোগ্যতার নিচে রয়েছে পাশবিক দেহলালসা।

চম্‌কে উঠলুম। কেউ শুনতে পায়নি ত? সোমেশ্বরের সংসর্গটা দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। স্পষ্ট ক'রে আত্মপ্রকাশ করাটা সারল্যের বাহাদুরি নয়, বৃদ্ধ বয়সে এফেক্ট্‌ করবার চেষ্টায় গ্রাম্য সারল্য দেখানোও পাঠশালার চালাকি। কিন্তু কী করা যাবে, জমিদারের ছেলে সোমেশ্বর, রাজা উপাধি তার, প্রতিবাদ করলুম না। কেবল নিরুপায় উৎকণ্ঠায় তার দিকে চেয়ে রইলুম পাছে আর কিছু বেফাঁস সে ব'লে বসে। এর চেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের নিন্দাও যে ছিল ভাল।

'তাই জন্যে অতৃপ্তি আর অবসাদ এসেছে আমার জীবনে।' সোমেশ্বর বললেন, 'একা থাকলেই—একা থাকলেই একটা ধূসর ছায়া আমার চোখের সাম্‌নে ধীরে ধীরে নেমে আসে। এমন একটা ধূসরতা যাকে বলা যেতে পারে নিষ্প্রাণ, বর্ণগন্ধহীন,অবসন্ন আর পরিশ্রান্ত। পূর্বজীবনের কোনো কোনো বঞ্চিত মুহূর্তে ক্বচিৎ কখনো একে দেখেছি।'

গেলাসটা তুলে নিয়ে তিনি খানিকটা তরল পদার্থ পান করলেন।— 'একে দেখেছি কোনো এক সন্ধ্যায় কি এক নদীর ধারে, হয়ত সাগরের কোনো তীরে, হয়ত জান্‌লার বাইরে আকাশের আত্মবিস্মৃত চিন্তায়। ভয় পেয়ে ছুটে এসেছি সংসারের অবিশ্রান্ত প্রাণপ্রবাহের মাঝখানে। কেমন একটা অশরীরী ছায়া এই বৃদ্ধকাল পর্যন্ত আমার পিছু পিছু চলে এসেছে। একটা সচেতন মন ভূতের মতো আমাকে অনুসরণ করেছে বাল্যকাল থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত। আমার চোখ দুটো চিরদিন ছিল প্রাণের দিকে আত্মগত, আত্মার তৃষ্ণায় তারা ছিল ব্যাকুল। সব দেখত, সব শুনত, কোনোটা বুঝত, কোনোটা থেকে যেত দুর্বোধ্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে এটা দেখতে পেতুম, মানুষ কোথায় দুঃখ পায়, কোথায় সে অকারণ নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, কোথায় বারে বারে আঘাত আসে দুর্বলের ওপর।'

বললুম, 'যারা অবস্থাপন্ন, যারা অর্থ ও শক্তির মালিক তারা এর প্রতিকার করতে পারে ত !'

'না—'সোমেশ্বর বললেন, 'একদিন যারা এর প্রতিকার করে, পরের দিন দেখা যায় তারাই আবার নির্যাতন করছে দুর্বলকে। একটা দল থাকেই যারা চিরদিন ধ'রে মার খায় শক্তিমানের হাতে; ইতিহাসে এই কথাটাই কেবল পাই। যেদিন আমার মাত্র আট বছর বয়স সেদিন থেকেই দেখছি এর চেহারা।'

বললুম, 'এবার ধরতে পেরেছি তোমার গল্প বলবার ভূমিকা।'

এমন সময় নিত্যদিনকার মতো রূপার গড়গড়ায় অম্বরী তামাক এলো। পাইপটা আমার হাতে দিয়ে চাকরটা গেল ভিতরে; হুইস্কির গ্লাসটা সোমেশ্বর নিঃশেষে পান ক'রে চোখ বুজলেন। এবং চোখ বুজেই বললেন, 'আমাদের ভবানীপুরের বাগান-বাড়ীটার কথা তোমাকে বলেছি সেদিন। আমাদের পরিবারে এককালে ছিল বহু স্ত্রী-পুরুষ, আজ তারা কে কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।'

বললুম, 'গল্পের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব বেমানান।'

'কিন্তু যদি সে নিজের জায়গায় এসে বসে ?'

'অত্যন্ত স্থূলাঙ্গ হ'লে ঠাঁই দেব না, সকলের সঙ্গে সমান ওজনের হওয়া চাই। নৈলে রসের নৌকা ভরাডুবি হবে।'

'চুল পাকলে মাত্রাজ্ঞান কমে যায়, তবু শোনো—'সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, 'অস্পষ্ট স্মৃতি, মনের ভিতর সব গোছান নেই। আমাদের সেই বাড়ীটায় একদিন একটি ভদ্রলোক এসে নিচের তলার রাস্তার ধারের ঘরখানা ভাড়া নিল। বাড়ীর ওদিকটা ভাড়া বিলি করবার জন্যই রাখা হয়েছিল। ছোট ছোট খণ্ড খণ্ড পরিবার পাখীর মতো উড়ে এসে সেই প্রকাণ্ড গাছের ডালে ডালে আশ্রয় নিত। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। যোগসূত্র পাশাপাশি থাকে বটে কিন্তু একটির সঙ্গে আরেকটির

সমুদ্রবৎ ব্যবধান। ঘরের কোলে অন্দরমহলের দিকে একটু রান্নার জায়গা, তারপরে উঠোন, বড় একটা বেলগাছ বাঁধানো,—একটি ক্ষুদ্র পরিবারের থাকার পক্ষে বেশ—'

একটু উত্যক্ত হয়ে বললুম, 'কথার মধ্যে এত খুঁটিনাটি দেখতে পেলে প্রাণ আমার হাঁপিয়ে ওঠে, চুল পেকেছে কিনা, সোজা কথাটা সোজা ক'রে মন শুনতে চায়।'

সোমেশ্বর একটু হাসলেন। বললেন, 'বার্ধক্যই বটে আমাদের! (গল্প মানে কেবল ঘটনা নয়, তাহলে 'নারীহরণের মামলা' সাহিত্য হয়ে উঠ্‌ত।')

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম। বৃদ্ধবয়সে 'নারীহরণের' দিকে আমাদের যে মনোযোগ আছে একথা কেউ শুনতে পায়নি ত? সোমেশ্বরকে নাড়া দিলে বিপদে পড়তে হয়।

তিনি বলতে লাগলেন, 'শোনো। ভাড়া নেবার পর থেকে সেই ভদ্রলোকটাকে আর দেখা যায় না, তিনি কোথায় থাকেন, কখন আসেন, কখন্ যান্ তার কোনো ঠিকানা নেই। কল্‌কাতার বাড়ীতে থেকে তখন আমি নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমার চোখে চিরদিন একটা কৌতূহল জেগে থাকে; শৈশবকালের সমস্ত ঘটনা আমার মনে আছে, সে কেবল দেখার গুণে। হ্যাঁ, একদিন একটি মেয়েকে দেখলুম,—আমারই সমবয়সী, সাত আট বছরের বেশি নয়।'

'আবার তোমার মৃণাল এলো নাকি?'

সোমেশ্বর চোখ খুললেন। বেশ নেশা হয়েছে তাঁর। প্রশান্ত চোখে চেয়ে বললেন, 'মোটা সোটা, গোল গাল, অত্যন্ত বাচাল, অতিরিক্ত দুষ্টু, ফুটফুটে মেয়েটি। দিনরাত নিচের তলায় ঘুরে বেড়ায় আর সুর ক'রে ছড়া কাটে। ভারি চটে গেলুম, দুরন্ত ব'লে আমার একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল, সেই কৃতিত্বটাকে ওই মেয়েটা যেন খর্ব করতে এসেছে। রাগ হবারই কথা। নাম তার বানু।'

'বানু?'

'হ্যাঁ, আট বছর বয়সেই বানুর প্রেমে প'ড়ে গেলুম।'

'চুপ, চুপ'—এদিক ওদিক তাকিয়ে নড়ে চ'ড়ে বসলুম। সর্বনাশ, এইবার বুঝি আরম্ভ হোলো।

সোমেশ্বর বললেন, 'নিজের কাছে নিজেই তখন রহস্যময়। ভালোবাসা বুঝিনে, বুঝি একটা অন্ধ আকর্ষণ। থাকতে পারতুম না ঘরে। গেলাম একদিন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। ব্যর্থ হলুম। এমন একটা কটূক্তি করলে বানু যে অখণ্ড শত্রুতায় আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। ফল ফলতে দেরি হোলো না, একটা পাথরের কুচি ছুঁড়ে সে একদিন এমন মারল যে আমার কপাল ফেটে হোলো রক্তারক্তি। এই ছাখো, সেই আমার প্রথম অপমানের চিহ্ন।'

বললুম, 'এমন বাল্যপ্রেম তরুণ সাহিত্যে পড়েছি সোমেশ্বর।'

'সেদিন কপালের রক্ত যখন ধরা পড়ল, পড়ে গেছি বলে কৈফিয়ৎ দিতে হোলো, প্রকাশ করতে পারলুম না যে একাজ আমার পরম শত্রুর। তোমাকে সত্যি বলছি বানুর চেয়ে প্রবল শত্রু, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সেদিন আর কেউ ছিল না। চুপি চুপি নালিশ করতে গেলুম তার মায়ের কাছে। সেই স্ত্রীলোকটির কথাই তোমাকে বল্‌ব।'

'স্ত্রীলোকের কথাই ত তোমার বলতে ভালো লাগে, বৃদ্ধ বয়সেও এই মুদ্রাদোষটা তোমার চলে এসেছে।'

সোমেশ্বর বললেন, 'পুরুষের চোখ প্রকৃতির দিকে, অচ্ছেদ্য বন্ধন দু'জনের। কেবল আলোছায়ার খেলা, কেবল চেনা-অচেনা। আজ মনে পড়ছে বানুর মা'র চেহারাটা। তোমাকে বোঝাতে পারব না তিনি ঠিক কেমন।'

উঠে দাঁড়ালুম এবং সোজা গিয়ে ভিতরের দিককার দরজাটা বন্ধ ক'রে এলুম। গল্পটার গতিক বিশেষ ভালো নয়।

'যতদূর মনে পড়ে বয়স তাঁর বেশি ছিল না। আর রূপ? তাঁর রূপের কথা যৌবনকালে ভেবে গানে গানে আমার মন উধাও হয়ে যেত। নালিশ করতে গেলুম। তিনি বললেন সস্নেহে হেসে, তোমাকে মেরেছে বাবা? ও হতভাগি বড় দুষ্টু, এসো আমি সারিয়ে দিচ্ছি।—তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন, তাঁর হাতের মধ্যে একটি অনির্বচনীয় মাতৃস্নেহ। রক্তের মূল্য দিয়ে পেলুম তাঁকে।

'চোখ, বড় বড় সে চোখ ভীরু মমতায় ভরা, সন্ত্রস্ত বাৎসল্যে অপরূপ। সমস্ত বাল্যকালটা আমার কেটেছে স্বার্থপর আত্মীয়গণের অতি-মমতায়, প্রাণের সম্পর্ক কমই ছিল, বানুর মা'র হৃদয়-লাবণ্যের ভিতর আমি একটি গভীর প্রাণের সম্পর্ক পেতুম। তাঁর কাছে সান্ত্বনা পাবার লোভে অতঃপর বানুর অত্যাচারকে আমি অভ্যর্থনা ক'রে নিতুম।'

এইবার উষ্ণ হয়ে বললুম, 'সব মেয়েকেই আদর্শ নারী হিসেবে দেখা তোমার অভ্যাস সোমেশ্বর।'

'আমি যে আর্য সভ্যতার দেশে মানুষ, আমি যে জানতে পেরেছি নারীর হাতেই আছে পরম অমৃত। তাদের কণ্ঠে আছে আমাদেরই আত্মার গান।'

হুইস্কির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, এমন বস্তুকে যারা বয়কট্ করতে বলে তারা আর্য সভ্যতার পরম শত্রু।

'যতদূর মনে পড়ে, দেখতুম মা আর মেয়ের দিন একলা কাটে। মা রাঁধে, মেয়ে যায় দোকান করতে। কখনো মা যেতো বাজারে, আন্‌তো তরিতরকারি, আন্‌তো দুধ কিনে। আমি থাকতুম দূরে দূরে ছায়ার মতো। অপরাহ্ণবেলায় বানুর মা সুর ক'রে পড়ত মহাভারত, বানু বসে থাক্‌ত পাশে। সেই আমি প্রথম মহাভারতের আস্বাদ পাই, প্রথম শুনি বিদুরের কাহিনী জান্‌লার পাশে লুকিয়ে। চোখ আমার জলে ভেসে যেত।'

'কেন, কাঁদ্‌তে কেন?'

'বলতে পারিনে—বৃদ্ধ বয়সেও জানতে পারিনে সেদিন কী আমার হোতো। সমস্ত বাল্যকালটা যেন কী এক বস্তু ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতুম, এখনো কি খুঁজিনে? এখনো নিশ্বাস ফেলি বটে কিন্তু চোখে জল আর আসে না। একা একা কতদিন যে অকারণে নির্জনে বসে কেঁদেছি তা বলবার নয়। যৌবনকালে জানতে পেরেছিলুম যে, একা থাকলেই আমার কান্না পায়।'

'এক্ একজন এমন আছে, নদীর পলিমাটির মতো মন, আঙ্গুল টিপলেই জল ওঠে। পৌরুষের কঠিন ভিত্তি নেই তাদের। তারা জাতির দুর্বলতার পরিচয়।'

সোমেশ্বর বললেন, 'খুঁটিনাটি বাদ দিই, কিন্তু বেশ মনে পড়ে বানুর মায়ের অতি সঙ্কুচিত চলাফেরা, যেন তাঁর পায়ের শব্দে মাটির বুকে আঘাত লাগবে! আমাদের মহলে এসে মাঝে মাঝে তিনি অনেক কাজ ক'রে দিয়ে যেতেন। এমন কি, বাসনও মেজে দিতেন। করুণ কুণ্ঠিত হাসি, কোমল ব্যবহার। নিজকে যে নগণ্য ক'রে জানালে, নগণ্যই হয়ে গেল সে সকলের কাছে একদিন। পাপের বাসা মানুষের মনে, তারা জানে না সৌজন্য, নম্রতা-আত্মসমর্পণের মূল্য দিতে। শোনো ঃ অশ্লীল গল্প এটা নয়।

'এম্নি করেই দিন চলে। বানুর সঙ্গে আমার হোলো ঘনিষ্ঠতা, অবিচ্ছিন্ন সান্নিধ্য। বাল্যপ্রেম কিনা জানিনে কিন্তু সে আমার পরমাত্মীয়, আত্মার আত্মীয়তা তার সঙ্গে। আমি দেহ, সে মন; আমি বায়ু, সে অগ্নি। কিন্তু আর একটা দিক ছিল। তারা দরিদ্র, তারা দুর্বল, তাই আমার বাড়ীর সবাই তাদের দেখতো কৃপার চক্ষে। আর সেই ভদ্রলোকটি, বানুর বাবা, সচরাচর তাকে দেখতুম না। নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দে চ'লে যেত, ভয় কর্‌তুম তা'কে দেখলে। বুঝতে পারতুম না, বানুর মা কেমন ক'রে তার সঙ্গে কথা বলে।

'একদিন ঘুরে গেল, ওলট পালট হয়ে গেল সমস্তটা। তখন বোঝবার

বয়স হয়নি কোথা থেকে কি হয়, কাজের পিছনে থাকে একটা কারণ। অনেক দেখেছি জীবনে, তারা এর চেয়েও জটিল, এর চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু—কিন্তু প্রথম জীবনের এই ঘটনাটা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে।'

মুখ তুললুম সোমেশ্বরের দিকে। গড়গড়ার পাইপটা আমার হাতে স্থির হয়ে রইল।

'একদিন সকালে উঠে আবিষ্কার করলুম হাওয়া গেছে বদ্‌লে। বাড়ীময় চাপা আলোচনা, জঘন্য নিন্দা, কদর্য হাসি, আর বান্নুর মা'কে লক্ষ্য ক'রে আমার পরিবারের একটি প্রবীণ স্ত্রীলোক সুরু ক'রেছেন নারী-চরিত্রের নির্দয় সমালোচনা। কী কদাকার বিদ্রূপ, কী কুৎসিত ইঙ্গিত! মেয়েদের সকলের চেয়ে প্রবল শত্রু কে জানো—মেয়েরাই। স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকের ব্যবহার কী ভয়ানক! তোমাকে বোঝাতে পারব না সেদিন ঝড় বয়েছিল কেমন ক'রে—কিন্তু কেন? কোথায় বান্নুর মা'র কি অপরাধ ঘটল?'

'একটু গলা নামিয়ে বলো সোমেশ্বর।'

'সেদিন আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি, মানুষ কী ভয়াবহ। যাদের আশ্রয়ের নিচে আমি মানুষ হয়েছি, যারা আমার পরমাত্মীয়, চেয়ে দেখি তারা কী সংঘাতিক জীব। শুনলুম বান্নুর মাকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা হচ্ছে, বান্নু কারো কাছে গেলেই নাসাকুঞ্চিত ক'রে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বয়স অত অল্প, তাই পরিবারের মধ্যে আমি মানুষ ব'লে গণ্য ছিলুম না, অর্থাৎ তখন আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার দিকে তাকিয়ে আমার মন কেবল এই কথাটাই বলতে লাগল, নিষ্ঠুর, এরা অতি নিষ্ঠুর। হোক বান্নুর মা অপরাধী কিন্তু তাকে শাস্তি দিতে আজ যারা উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা বর্বর, তারা পশু; আশ্চর্য, আমি জানতুম না আমার বাড়ীর প্রত্যেকে এক একজন এত বড় সাধু, এত বড় সচ্চরিত্র। সেদিন থেকে সচ্চরিত্র লোক দেখলেই আমি ভয় পাই।

'লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতুম। যে বানুর গলা ধরাধরি ক'রে হৈ চৈ করা ছিল আমার সারাদিনের কাজ, তাকে ছাড়তে হোলো একেবারে। বাল্যকালে বুদ্ধি-বিচারের চেয়ে হৃদয়াবেগের খেলা চলে বেশি। লুকিয়ে লুকিয়ে চোখে চোখে কথা বলবার চেষ্টা করতুম তার সঙ্গে; আর দেখতুম তার মাকে,—আঁচলে চোখ মুছে মুছে দুটি চোখ তাঁর রাঙা। মনে হোতো গিয়ে দাঁড়াই তাঁর কাছে। কিন্তু যাবো কেমন ক'রে? আমরা সবাই তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছি, ষড়যন্ত্র করেছি,—সেই দলভুক্ত আমাকে যদি তিনি বিশ্বাস না করেন? আত্মসম্মান খোয়াবো?'

বললুম চুপি চুপি, 'অর্থাৎ সাব্যস্ত হোলো মেয়েটা চরিত্রহীন?'

'আজো সেটা জানতে পারিনি স্পষ্ট ক'রে। অথচ বড় হয়ে বুঝেছি ওই একমাত্র কারণ। মানুষকে সহজে অপমান করবার অত বড় অস্ত্র আর নেই।'

'থাক্ সোমেশ্বর, মরণকালে চরিত্রহীনদের পক্ষে আর ওকালতী ক'রে কাজ নেই।'

সোমেশ্বর বললেন, 'চরিত্রহীন হয়ত সে, কিন্তু ভদ্রমানুষ ব'লে তার মূল্য দেবো না কেন? বানুর মা যে আমাদের নিতান্ত আশ্রিত নয়, সে যে বাড়ীর ভাড়া দিয়ে জোরের সঙ্গে থাকতে পারে, যুদ্ধেও নামতে পারে বলবানের বিরুদ্ধে একথা আমরা ভুলে গেলুম। সেই কথাটাই তোমাকে বলব। একদিন দেখি পাথরও উঠল গরম হয়ে। অপমানের বিরুদ্ধে বানুর মা সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে, টাকা দিয়েছি, ছাড়ব না এঘর, দেখি কে আমাকে তাড়ায়।—আমার পরমাত্মীয়রা ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো তার দিকে ধাবিত হোলো। বাড়ীর মেয়েরা অলজ্জ ভাষায় এক বিশেষ পল্লীতে তার স্থান নির্দেশ ক'রে দিল। যতদূর আজ মনে পড়ে, বানুর মা চীৎকার ক'রে সমানে সমানে তার প্রতিবাদ করতে লাগলো। মুখ খুলে যে মানুষ কথা বলেনি কোনদিন, তারই বিদীর্ণ কণ্ঠের উচ্চ প্রতিবাদে

সেদিন আশেপাশের সবাই সচকিত হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পেরেছ? আত্মবিস্মৃত অন্যায়ের বিপক্ষে নিরুপায় দুর্বলের প্রতিবাদ তার নাম; সেই আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে দেশে দেশে, সেই আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হবে কালে কালে।'

'তারপর?'

'তারপর যা হয়। পাড়ার লোক এসে জড়ো হোলো, বললে, অত ঝগড়ায় কাজ নেই, বাড়ী ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু সেই ভদ্রলোকটা? বান্নুর সেই বাপ?'

'সে ত' আগেই নিরুদ্দেশ। বান্নুর মা বলতে পারলে না সে কোথায়, প্রমাণ করতে পারলে না তার সঙ্গে নিজের সত্য সম্পর্কটা কি। আসে আর যায়, এই কেবল জানতুম।

'কিছুকাল বাদে দেখ্‌লুম একদল পুলিশ এলো, তারা এসে বান্নুর মা'র ঘর ঘেরাও করলে। দেখ্‌লুম আমরা কত ছোট, কত নিচে নামতে পারি। দোতলার জান্‌লায় আমি ছিলুম দাঁড়িয়ে। চেয়ে দেখ্‌লুম, দরিদ্রের দুর্বলের ভগবানও নেই। পুলিশ-পেয়াদায় মিলে বান্নুর মা'র গৃহস্থালীকে দিল ছিন্নভিন্ন ক'রে। জিনিসপত্র, কাপড় চোপড়, কড়াখুন্তি ছুঁড়ে ছুঁড়ে টেনে ফেলতে লাগল রাস্তায়, ভিখারিণীর চালের হাঁড়ি গড়াল পথের ধারে। আজো—আজো আমার চোখে জল আসে সেই কথা মনে পড়লে।'

চুপ ক'রে রইলুম। সোমেশ্বর পুনরায় বলতে লাগলেন, 'একখানা ভাড়াটে গাড়ী ক'রে সেই দুপুরের রোদে উপবাসী মা আর মেয়ে কোথায় যে সেদিন ভেসে গেল, কে জানে। আমি ছিলুম জান্‌লায় দাঁড়িয়ে। আমি যেন সকলের চেয়ে নিকট আত্মীয়কে হারালুম। দুঃখে অপমানে যাদের বুক ভেঙ্গে যায়, নির্যাতন আর কলঙ্কে যে পাতকীরা পথের ধূলোয় মাথা হেঁট করে তাদের সঙ্গে কোথায় যেন আমার একটা নিবিড় আত্মীয়তা আছে।

'জীবনে আর দেখিনি তাদের, হয়ত আর দেখার দরকারও ছিল না। যৌবনকালে এক সময় কতবার খুঁজতে বেরিয়েছি সেই মা আর মেয়েকে। দেখা পেলে প্রায়শ্চিত্ত করতুম।'

বললুম, 'এতদিনে অবশ্যই নির্বাণলাভ করেছে।'

'তাহলে ধন্যবাদ দেবো ভগবানকে।'

গড়াগড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে সেদিনকার মতো উঠে দাঁড়ালুম। হুইস্কির নেশায় চোখ বুজে সোমেশ্বর সম্ভবত পারলৌকিক চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন।

আমরা—অর্থাৎ আমি আর সোমেশ্বর, বৃদ্ধ ব'লে যারা আজ জনসমাজে পরিচিত, আমরা চঞ্চল নই, চাঞ্চল্য আমাদের শোভা পায় না। প্রথম বয়সে মানব-চরিত্রের থাকে নানা অলঙ্কার, নানা আভরণ, শেষের দিন যত ঘনিয়ে আসে সেগুলি একে একে খসে যায়, তখন বেরিয়ে আসে আসল মানুষের রূপ। সংসারের গায়ে নানা রং ফলিয়ে আর আমরা মোহ সৃষ্টি করতে চাইনে, আমরা গীতাপাঠ করেছি, সহজ হয়ে বিদায় নেবার চেষ্টায় আছি।

জীবন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, তার আর বিস্তৃতি নেই, ব্যাপকতা নেই। কাজ ফুরোলে মানুষ বাঁচার অযোগ্য হয়ে ওঠে। সোমেশ্বর আর আমি—সংসার থেকে আমরা বাতিল। স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিনি, স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণও করতে পারব না,—পরমশক্তির হাতের খেলনা হয়ে বসে আছি। বার্ধক্যের চেহারা ধূসর,—সোমেশ্বর সেদিন বলছিলেন, আলো এবং অন্ধকারের সন্ধিস্থলে বসে বসে মুহূর্ত গণনা করছি। চেয়ে আছি নদীর ওপারে যাবার আশায়।

জানলার বাইরে তাকিয়ে ঘরের মধ্যে বসেছিলুম। কোনো কাজ নেই, কাজের দায়িত্ব আমার আর সোমেশ্বরের ফুরিয়ে গেছে। এমন সময়

আমার স্ত্রী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধকালে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ভারি কৌতুকপূর্ণ। তিনি আমার জন্য ছোটেন না, আমি তাঁর জন্য হাঁপাইনে। পরস্পরের দিকে আর আমরা তাকাইনে, চোখে মুখে কোনো চপলতা প্রকাশ পেলে নিজেরাই এখন লজ্জিত হই। দু'জনের মুখ দু'জনের কাছে অতি পুরাতন, অতি পরিচিত তাঁর মুখে কোথায় কোন্ রেখাটি আছে তা পর্যন্ত আমার মুখস্থ,—তাঁর শরীরের সর্বস্থানে দিনে দিনে মহাকালের প্রত্যেকটি পদচিহ্ন আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি। তিনি পানের মুখে একটু দোক্তা দিয়ে বললেন, তোমার মেজছেলে যে পাশ হয়েছে। এই খবর এল।

বললুম, বাপের নাম ডোবালে আর কি।

আহা ঢঙ, তুমি মুখ্যু হ'লে কি আর এত দুঃখ পেতুম, কত সুবিধে হোতো। পাশ হোলো বাঁচলুম, এবাব পৌনে তিনশো টাকা মাইনেব চাকৃরি হবে।

সে আবার কি চাকৃরি ?

খবর রাখা হয় না কিছু, সেই যে দিল্লীতে এক্‌জামিন দিতে গিয়েছিল, রেল-কোম্পানীর চাকৃরি—আমার ছেলেরা বংশের মুখোজ্জ্বল করেছে।

বললুম, বাপের নাম ডোবালে।

স্ত্রী এবার উষ্ণ হয়ে বললেন, মরণ আর কি, ও-কি কথার ছিরি ?

বললুম, এবার যদি মরি তোমার কিসের দুঃখ ?

ছাই দুঃখ। নিজের কপাল নিয়ে মরবে তা আমি কি করব ? আমার ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি,—সকলে আমায় কোলে নিয়ে গঙ্গায় দিয়ে আসবে, আমার ভাবনা কিসের ?

জান্‌লার বাইরে চেয়ে রইলুম। এই বিগতযৌবনা স্ত্রীলোকটি যৌবনকালে একটি দিন মাত্র আমাকে না দেখলে বিরহবেদনায় অস্থির হোতো। এমন সতী নারী আমি খুব অল্পই দেখেছি। যখন তখন

বলতো, মাথার সিঁদুর মাথায় ক'রে যেন নিয়ে যেতে পারি, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমার সঙ্গসুখ ভোগ ক'রে যাবার বাসনা তাঁর একান্ত।

বললুম, দেখো সবই ত হোলো, চলো এবার কাশী যাই। ঠাকুরের পায়ের তলায় মাথার সিঁদুর নিয়ে গঙ্গালাভ করবে।

তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, অমন কথা মুখে এনো না, মরতে হয় তুমি মরগে। বাছাদের ছেড়ে আমি যাবো কোথায়?

আমার সঙ্গে স্বর্গ যেতেও এখন আর তিনি রাজি নন্। অত্যন্ত ঈর্ষার উদ্রেক হোলো। আমার অনুগ্রহেই এই স্ত্রীলোকটি যা কিছু লাভ করেছে, এখন আমাকেই অবহেলা। বিকৃতকণ্ঠে তরুণ সাহিত্যের নায়কের মতো বললুম, বাছারা তোমার ছিল কোন্ চুলোয়?

ঝগড়া ক'রো না বাপু, নানান্ জ্বালার শরীর, মরছি অম্বলের ব্যথায়। যাও না বেরিয়ে সেই বুড়ো মাতলটার ওখানে, তামাক খেতে দেবে'খন।—ব'লে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বড় বৌমার ছোট্ট ছেলেটা এসে তাঁর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অমন ঠাকুরদাদার মুখ দেখিস্‌নে, চল্ দাদা আমরা যাই।—ব'লে কাঁকালে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে তিনি তাঁর স্থূল ও ভারাক্রান্ত দেহের বোঝা টান্‌তে টান্‌তে গড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কোথায় যেন আমি নিরাশ্রয় বোধ করি। ভিতরটা ঠিক খালি হয়ে গেছে। কেন—তা জানি। আমার স্ত্রী ব'লে জনসমাজে পরিচিত এই স্ত্রীলোকটি, আমাকে না হ'লে যার দিন কাটত না,—এ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। অধ্যবসায় সহকারে একটির পর একটি সন্তান লাভ ক'রে এই স্ত্রীলোকটি আর এখন আমাকে গ্রাহ্য ক'রে না, কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। প্রেম, প্রণয় ইত্যাদি অনুভূতিগুলোকে বাৎসল্য ও স্নেহে রূপান্তরিত ক'রে আমাকে নির্বাসন দিয়েছে। আমার চেয়ে এখন তার কাছে সন্তান-সন্ততির দাম বেশি।

মেয়েরা ভক্ত তারুণ্যের ; নবপ্রাণ ও নবীন শক্তির কাছে তারা সারাজীবন মাথা নেয়ায়। কোনো তরুণী কোনো বৃদ্ধের প্রতি আসক্ত এমন কথা আমি শুনিনি, কিন্তু বহু বয়স্কা স্ত্রীলোক তরুণ যুবকের মোহমুগ্ধ এমন সংবাদ আমার দপ্তরে অনেক জমা আছে।

আক্রোশে, বিদ্রোহে চিত্তদাহে উঠে দাঁড়ালুম। ভেবেছিলুম গীতাখানা একবার উলটাবো—থাক্, লাঠিটা হাতে নিয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে বিরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাস্তবিক, যৌবনকালে সন্ন্যাস নেওয়াই আমার পক্ষে সঙ্গত ছিল।

উঠোনে নাতিটি ধূলোবালি নিয়ে খেলা কচ্ছিল। দৌড়ে এসে লাঠিটা ধ'রে বললে, দাদাবাউ, কোতায় দাত্তো ?

চিবুক নেড়ে দিয়ে আদর করলুম। ইচ্ছে হোলো গলাটা টিপে দিয়ে এখানে শেষ ক'রে দিই। কিন্তু লাঠিটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্ত হয়ে বললুম, চুলোয় যাচ্ছি, যাচ্ছি মদ্যপান করতে। ব'লে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেলুম।

পথে নেমেই উত্তেজনাটা কমে গেল। রাগ হ'লে শরীরে এখন একটু কাঁপুনি আসে মাত্র। কিন্তু তার স্থায়িত্বও অল্পক্ষণ। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার আসক্তির কথা অস্বীকার করব না, আসক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ আমি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী। পুত্র ও পৌত্র, কন্যা ও নাতনীদের সঙ্গে আমার একটা সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে এটা অত্যন্ত সত্য কথা। আমার স্ত্রীর হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কেউ যে স্থান পেয়েছে এ আমি সহ্য করতে পারিনে। কোথায় একটা বিদ্বেষ জেগে ওঠে। যৌবনকাল হ'লে এই ঈর্ষার জ্বালায় বিষপান ক'রে আত্মহত্যা করতাম, পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ নিতাম, কিন্তু এই বয়সে তেমন কাজ আর করা চলে না, হয়ত বা সবাই খুশীই হবে।

আমার মৃত্যুতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই—এই চিন্তাটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত

করে। বেঁচে থাকার চেষ্টা করি প্রতিমুহূর্তে। পায়ে যেন কুশাঙ্কুরটিও না ফোটে। গাড়ী ঘোড়া দেখলে এক পাও নড়িনে। এইখানে আমার সঙ্গে মেলে না সোমেশ্বরের। তিনি ভয় করেন না মৃত্যুকে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বেশ প্রশান্ত জীবন যাপন করেন। ক্ষোভ কিছু নেই তাঁর, তিনি জীবনকে নানা দিকে ভোগ করেছেন।

বার্ধক্য এমন একটা অবস্থা যে-সময় সহজে মানুষের সঙ্গী জোটে না। বয়সটা ভয়ানক বাধা। যৌবনবয়সে অবারিত দ্বার খোলা, কত আনাগোনা, কত জানাশোনা, নানা চরিত্র এসে দাঁড়ায় নানা রসের ইঙ্গিত নিয়ে। বরণ করতে কুণ্ঠা নেই, বর্জন করতে সঙ্কোচ নেই। কিন্তু বার্ধক্যে বজায় রাখতে হয় সম্ভ্রমবোধ, গাম্ভীর্য ও রুচি। বার্ধক্যের চারিদিকে একটা দুঃসহ নিরানন্দ পরিমণ্ডল আছে, সেই গণ্ডীর ভিতরে আসতে মানুষ ভয় পায়, সেই গণ্ডীর বাইরে যেতে বৃদ্ধদের আসে সঙ্কোচ,—পরন্তু তার ভিতরে একটা মৃত্যুর জাল নিরন্তর সৃষ্টি হতে থাকে। সেখানকার আকাশ ধূসর, বাতাস ভারাক্রান্ত, আলো এবং অন্ধকার সংমিশ্রিত একটা বুকচাপা দুঃখদায়ক আবহাওয়া। আমি এখন সেই সন্ধিক্ষণে।

আজ সন্ধ্যার অনেক পূর্বেই সোমেশ্বরের বৈঠকখানায় গিয়ে উঠলুম। এখানে ছাড়া আর আমার স্থান কোথায়? এই বৃদ্ধ মাতাল লোকটা ছাড়া আর যে কোনো সঙ্গী নেই। লোকটার জীবনের কথা শুনতে শুনতে আমি হায়রাণ। আমাকে গড়গড়ার নলে বেঁধে রেখে এই উচ্ছৃঙ্খল মাতাল তার সমস্ত নির্বুদ্ধিতার কাহিনী একে একে ব'লে যাবে, আর আমাকে শুনতে হবে দিনের পর দিন। গতিহীন স্থবিরত্বই বার্ধক্যের প্রকৃত রূপ; ভবিষ্যতের দিকে যে তাকায় না, অতীত জীবনের দিকে যে মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকে, বুঝতে হবে তার মৃত্যু ঘটেছে। ইচ্ছা করে বিদ্রূপ ক'রে তাড়িয়ে দিই এই বার্ধক্যটাকে, হাসির ফুৎকারে উড়িয়ে দিই স্থবিরত্বের এই আনন্দহীন আবহাওয়াটাকে।

বসতে যাব এমন সময় ভিতর থেকে সোমেশ্বর ও একটি তরুণী বেরিয়ে এলেন।

এই যে, মেশোমশাইও এসে পড়েছেন—ব'লে সান্ত্বনা এসে হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধূলো নিলেন। পায়ে এসে ঠেকেছে আমার দিন, এবার এখান থেকেই বিদাই নেবো। বললুম, ভালো আছ? তোমার স্বামীর এখন কেমন অবস্থা মা?

সেই রকমই মেশোমশাই।—তারপর সোমেশ্বরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সান্ত্বনা বললেন, যদি যান্ জ্যাঠামশাই তবে দু'জনেই যাবেন বলে রাখলুম। আমি ততক্ষণ এগোই।

তাই যাবো। ব'লে সোমেশ্বর ইজিচেয়ারে ব'সে পড়লেন। সান্ত্বনা খুশীতে মুখ উজ্জ্বল ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

তামাক এসে হাজির হোলো। কিয়ৎক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর সোমেশ্বর বললেন, তোমার ত সামান্যই পরিচয় এই মেয়েটির সঙ্গে।

বললুম, মোটেই পরিচয় নেই। কবে যে মেশোমশাই হয়ে উঠলুম জানতেও পারিনি। সম্পর্ক না পাতালে মেয়েরা খুশী থাকে না!

সোমেশ্বর বললেন, এসেছিল আমার বড় বৌমার কাছে, তাঁর বন্ধু। জানো ত, আমার বড় বৌমা একটু দাম্ভিক প্রকৃতির, অর্থাৎ বড়লোকের ঘরের বউ,—সান্ত্বনার সঙ্গে তিনি ঠিক বন্ধুর মতো ব্যবহার করেন না, একটু উচ্চ-নীচ সম্পর্ক থাকে।

এসেছিল কেন?

গরীব মেয়ে, মাষ্টারি ক'রে চলে না, জামা সেমিজ সেলাই করে,—বড় বৌমার কাছে আসে সেগুলো দোকানে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে। বড়ঘরের বউ আমার বড়বৌমা বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত থাকেন, সব সময় সান্ত্বনার মতো দরিদ্রের দিকে তাকাবার তাঁর সময় নেই।

সোমেশ্বর একটু উত্তেজিত হয়েছেন বোঝা গেল। বললুম, বড় ঘরের

বৌ হওয়াটা বড় অপরাধ নয়, তাঁকে যে অহোরাত্র পরোপকারে ব্যস্ত থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতাও নেই সোমেশ্বর। বড় ঘরের বউয়ের বড় কাজও থাকতে পারে।

তর্কে আমাদের উৎসাহ নেই, আমরা বৃদ্ধ,—সহজেই আমাদের তর্ক যায় থেমে।

সোমেশ্বর বললেন, এসেছিল কিছু অর্থের জন্যে। স্বামীর অসুখে খরচ হয় অনেক, দিন চলে না। আজকে বড়বৌমার মারফৎ টাকা পাবার কথা ছিল, কিন্তু সারাটা দিন বড়বৌমা তাঁর প্রবাসী স্বামীকে পত্র লিখতে এমনিই ব্যস্ত ছিলেন যে জামার দোকান থেকে টাকা আনতে পারেননি। জমিদারের পুত্রবধূ কিনা, প্রেমপত্র লিখতে একটু সময় লাগে। চলো, যাবে নাকি ?

গড়গড়ার নলে সুখটান দিয়ে উঠে বললুম, চলো।

গাড়ী তৈরি করবার জন্য ড্রাইভারকে ডাকতেই নিষেধ ক'রে বললুম, গরীবের বাড়ী পায়ে হেঁটেই যাই চলো, গাড়ী থাক্। এই ত কাছেই।

বেশ তাই চলো।

বাগান ও গেট্ পার হয়ে দু'জনে পথে নামলুম। দু'জনের হাতেই লাঠি, লাঠিছাড়া আমরা চলতে পারিনে। এই মধুর বসন্তকালেও ঠাণ্ডার ভয়ে আপাদমস্তক আমাদের ঢাকা। শীতের ভয় করিনে, ভয় করি মৃত্যুর। আজকের দিনটিতে আমাদের কিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। শুনেছি এক বিশেষ জন্তু বিশেষ সময়ে অন্ধকার গহ্বর আশ্রয় করে, আমাদের বার্ধক্যে আমরা অন্দরমহলের বন্দী জীবন আশ্রয় করেছি, বাইরের আলো-হাওয়ার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখিনে। আজ আমাদের একটু নূতনত্ব।

পথে চলতে চলতে সোমেশ্বর আলোচনা করতে লাগলেন সান্ত্বনার সম্বন্ধে। মেয়েটির জীবন-সংগ্রামের চমকপ্রদ ইতিহাস গভীর সহানুভূতিতে তিনি ব'লে যেতে লাগলেন। স্বাধীন জীবনযাপনের অপূর্ব আয়োজন তার।

মাথা হেঁট করেনি কোথাও। একটি যুবককে ভালবেসে বিবাহ করে। স্বজাতি নয় সুতরাং বিবাহটা ঘটেছে অসবর্ণ মতে। বলতে বলতে সোমেশ্বর একসময় একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে ঢুকে এক জায়গায় এসে থামলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়েছে। বললেন, এইটেই সতের নম্বরের বাড়ী।

বাড়ীটা অতি পুরোনো, একতলা। ভিতর থেকে জানলা-দরজা সব বন্ধ। কাছাকাছি পথে কোথাও আলো নেই। গলার সাড়া পেয়েই দরজা গেল খুলে, সান্ত্বনা এল বেরিয়ে। মুখখানা হাসিতে ভরে' বললে, এই যে আসুন আপনারা।

সোমেশ্বর বললেন, চলো, তোমার কোনো অসুবিধে হোলো না ত সান্ত্বনা?—দুজনে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম।

বিলক্ষণ, এমন অন্যায় অসুবিধে হবেই বা কেন? আসুন, মাদুরটা পেতেই রেখেছি আপনাদের জন্যে। ভাবলুম রাত হয়ে গেল, আর বুঝি এলেন না।

আমি বললুম, ভেবেই ছিলুম আসব একদিন তোমার এখানে, সময়ও হাতে থাকে, তবু ঠিক হয়ে ওঠে না। আমি আবার সোমেশ্বরের চেয়েও কুড়ে।

সান্ত্বনা স্নিগ্ধ হাসি হাসল। বললে, এমনি করেই কোনো রকমে চালাই মেশোমশাই। বড়বৌদিদি ছিলেন ব'লেই আমার অভাব-অভিযোগ এখনো মিটছে। আমার জন্যে অনেক করেন তিনি।

কৃতজ্ঞতার চেহারা বোধ করি এই রকমই করুণ ও কুণ্ঠিত। কিন্তু এই অবসরে একবার চারিদিকে দেখে নিলুম। যৎসামান্য দরিদ্র গৃহসজ্জা, অনটনের চিহ্ন সর্বত্র। তবু তাদের পরিচ্ছন্নতা ও সুবিন্যাস প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের পিছনে রয়েছে একটি মমতাময় মনের অক্লান্ত সেবা ও যত্ন। বিলাসের অকারণ সাজসজ্জা ও ঐশ্বর্যের উপকরণ-

বাহুল্য আপন দম্ভের রূঢ়তায় দৃষ্টিকে কোথাও আঘাত করে না, চক্ষু ছাড়া পেয়ে বাঁচে।

সোমেশ্বর বললেন, তোমার স্বামী কেমন আছেন ?

ওই ত দেখুন না মিশিয়ে রয়েছেন বিছানার সঙ্গে। আজ পাঁচ বছর হোলো। পাঁচ বছর ধরে' ভাবছি এইবার উনি সেরে উঠবেন।

ঘরের একান্তে দুজনেই তাকালুম কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। চতুর্থ একটি মানুষ যে এঘরে রয়েছে এ এতক্ষণ ঘুণাক্ষরেও আমি বুঝতে পারিনি। নির্বাক হয়ে রইলুম।

সান্ত্বনা বলতে লাগল, সেই সে কালাজ্বর হোলো তারপরই পক্ষাঘাতে হয়ে গেল ডানদিকটা পঙ্গু, নড়বার শক্তি নেই। আত্মীয় স্বজনরা ত্যাগ করেছেন, এমন বিয়ে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

সান্ত্বনা আবার একটু হাসল। দিনের আলোয় তার মাথায় যে এয়োতির চিহ্নটুকু দেখা গিয়েছিল, এখন এই রাত্রের অস্পষ্ট আলোয় মনে হোলো, সেই সিঁদুরের চওড়া দাগটা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেটুকু যেন আপন মহিমায় প্রদীপ্ত অকম্প অগ্নিশিখার মতো।

টুম্‌টাম রোজগার করতেন আগে, তাতেই চলতো। কিন্তু এই অবস্থা হয়ে পর্যন্ত···আর ত কোনো সম্বল নেই। মাঝে অতি কষ্টে একবার নিয়ে গিয়েছিলুম ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের ওষুধ খাওয়াতে, নিয়ে যাওয়াই সার হোলো। ডাক্তার বলছেন, এ অসুখ সহজে সারে না।

বললুম, কিন্তু এমন ক'রে তোমার চলবে কতদিন ?

তাই ত ভাবছি মেশোমশাই। পাঁচটা বছর ত গেলই, আর পাঁচটা বছরেও যদি উনি সেরে ওঠেন। আমার জন্যে ভাবিনে, যতদিন আমার শক্তি-সামর্থ্য আছে···দুপুর বেলা ইস্কুলে পড়াতে যাই, একটা টিউশনিও সেরে আসি। আর রাতে···ওই দেখুন না সিংগার মেসিন্, সেলাই, ফোঁড়াই করি। কিন্তু হ'লে কি হবে, বাজার আজকাল বড় মন্দা।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে তিনজনে বসে রইলুম। কথা বলবার বিশেষ কিছু নেই। সমস্তটা এতই সুস্পষ্ট যে প্রশ্ন করা ও তার উত্তর পাওয়া নিতান্তই বাহুল্য। এ কেবলমাত্র অনুভব করবারই বস্তু।

অদূরে শয্যার দিকে তাকিয়ে হেসে সান্ত্বনা বলতে লাগল, আজকাল ত প্রায় আমার সঙ্গে কথাই বলেন না, অসুখে-অসুখে একটু খিটখিটে হয়েছেন কিনা—বলতে বলতেই সে আরো হেসে উঠল,—মাঝে একটু মাথার দোষ হয়েছিল, এমন ত হয় মানুষের কিনা···ছোট ছেলে যেমন রাগ ক'রে মা'কে মারধোর করে—

সোমেশ্বর এবার মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। বললেন, তারই কি চিহ্ন তোমার মুখে হাতে?

ওঁর আর অপরাধ কি বলুন, তখন অজ্ঞান—

ওদিকে বিছানা একটু নড়ে উঠলো, সান্ত্বনা উঠে সেইদিকে দ্রুতগতিতে গেল। অস্পষ্ট আবছা আলোয় বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে' সস্নেহে বললে, এই যে আমি, কাছেই আছি, কিছু বলবে?

রুগ্ন ব্যক্তিটি ভগ্নকণ্ঠে কি যেন বলে' উঠল, এবং তা যে একটা অত্যন্ত অভদ্র কটূক্তি, এত দূরে বসেও আমাদের কানে স্পষ্ট হয়ে বাজল। সান্ত্বনা আবার হাসিমুখে উঠে এল। বললে, অনেকক্ষণ খাননি কিনা, রাগ হয়েছে।

তা ত হতেই পারে, রোগা মানুষ···তুমি ওকে খেতে দাও মা, আমরা তবে এখন উঠি।—বলে' সোমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন।

সান্ত্বনা আমার দিকে ফিরে বললে, মেশোমশাই, আপনিও যদি জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে এক-আধদিন আসেন তাহলে বড়ই খুশী হবো।

আসব বৈ কি মা, নিশ্চয় আসব।—বলতে বলতে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা পার হয়ে পথে নেমে পড়লুম। হঠাৎ আজকের সন্ধ্যাটায় মনে হোলো, আমরা যেন গভীর কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে গেছি।

সম্ভবত ভাবের একটা ঘোর লেগে গিয়েছিল, পথে এসে সজাগ হয়ে উঠলুম। ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মচেতনার মূল যেন শিথিল হয়ে এসেছিল, পথের আলো লোকজন ও গাড়ীঘোড়া দেখে আবার আত্মস্থ হয়ে নিলুম। ফিরে পেলুম নিজেদের। লাঠিটা ধরলুম শক্ত হাতে, দৃঢ় পদক্ষেপ করতে লাগলুম। যেন একটি পরম রহস্যময় রাজ্য থেকে ফিরেছি, এ পৃথিবী থেকে সেটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, মানুষের কোলাহলের আওয়াজ সেখানে পৌছায় না। আমরা যদি অকস্মাৎ যন্ত্রজর্জরিত শহর-সভ্যতার রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে লতাবিতান বেষ্টিত তপোবনের সামগান মুখরিত পর্ণকুটীর দেখি, তবে কী হয় মনে?

সোমেশ্বর এইবার কথা বললেন, কোন্ দিকে যাবে?

অবাক কাণ্ড, যাবো বাড়ীর পথে?

বাড়ী? এমন মুহূর্ত আসে যখন মনে হয় ঘরে ফিরব না, ঘুরে বেড়াব পথে পথে।

এবার উষ্ণ হয়ে বললুম, বারবার লক্ষ্য ক'রে দেখেছি শুক্লপক্ষের দিকটায় তোমার মেজাজটা ভালো থাকে না সোমেশ্বর। বাড়ী ফিরব না ত যাবো কোথায় এই বুড়োবয়সে?

সোমেশ্বর বললেন, মনে হচ্ছে তীর্থদর্শন ক'রে ফিরছি।

কেন? তুমি কি মনে করেছ আমি মেয়েটার সতীত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছি! অযোগ্য আর অকর্মণ্যের পায়ে প্রতিদিন আত্মবলিদান, কেবলমাত্র একটা মরীচিকার পিছনে ছুটে চলা, এতবড় আত্মহত্যাকে তুমি সতীত্ব বলো? দিনের পর দিন, বছরের পর বছর জপের আসনে ব'সে থাকা, এর নাম সতীত্ব? পদসেবা আর দাসীপনা কি এতবড় গৌরব?

সেমেশ্বর সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের নায়িকার চরিত্রের আদর্শ নিয়ে কিন্তু এর বিচার ক'রো না।

বিচারের আদর্শের কথা হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক কোনো অবাস্তব নারীচরিত্র নিয়ে হৈ চৈ করেন নি, এটা ঠিক ত?

তার কারণ তাঁর শক্তি নেই অবাস্তবকে সত্য ক'রে দেখানো। রসের ভাষায় অপ্রত্যাশিতকে কাছে এনে দাঁড় করানোই সাহিত্য-শক্তি। তোমার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের সাহিত্য-প্রতিভার একমাত্র গুণ কি জানো?—ভদ্রঘরের মেয়েকে বেশ্যায় রূপান্তরিত করা এবং অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের কপালে সতীত্বের ছাপ মেরে ছেড়ে দেওয়া—কালের গুণে এই পেশা নিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে উঠেছেন ইতর সাধারণের চোখে। চলো, এবার ফেরা যাক্।—সোমেশ্বর উত্তেজিত হয়ে অগ্রসর হলেন।

তবু কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে গেল, সে কিন্তুটা আমার নিজেরই মনে। পদসেবা আর দাসীপনাই নারীর গৌরব নয়—এমন কথা প্রকাশ ক'রে সান্ত্বনাকে খাটো ক'রে এলুম কিন্তু এই বৃদ্ধকালেও মন বলছে, সততা ছাড়া ভালোবাসার আর কোনো পরিচয় আছে কি? অযোগ্য আর অকর্মণ্যের পায়ে সান্ত্বনা নিজকে বলি দেয়নি,—সোমেশ্বর বলছিলেন, তার অন্তরে প্রেমের একটি ভাবরূপ, স্বামীটি তার মনের মন্দিরে একটি রসমূর্তি। যে লোকটি অকর্মণ্য, স্থবির ও পঙ্গু—সে বড় নয়, সান্ত্বনা সেবা করে আপন অন্তরদেবতার। মেয়েরা স্বামীর সেবার ভিতর দিয়ে পূজা পাঠায় আপন মনোমন্দিরে।

একটু ব্যস্ত হয়ে বললুম, মেয়েদের চরিত্রের সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ইঙ্গিত করা এখনকার দিনে একটা ফ্যাশন্ হয়ে উঠছে।

দুর্বোধ্য যদি হয় তবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। তোমার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের ভাষায় বলি, ওটা দুর্জ্ঞেয়।—ধীরে ধীরে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে সোমেশ্বর বলতে সুরু করলেন, মানুষ ত নিজেই সৃষ্টির এই অনন্ত মহাকাব্যের এক একটি সিম্বল্, তাদের চরিত্রের ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিপুল ঐশ্বর্যকে আমরা অনুভব করি। রূপের পারে রস, কথার পারে

ব্যঞ্জনা, ফুলের পারে যেমন গন্ধ। সান্ত্বনার কথা ছেড়ে দাও কিন্তু এমন মেয়ে আছে যার সমস্তটাই সাদাসিধে, সরল এবং সহজবোধ্য।

সান্ত্বনা কি সরল নয়? সহজবোধ্য নয়?

সোমেশ্বর বললেন, তোমার প্রশ্নটা আমার মধ্যেও থেকে গেছে। কিন্তু এটা জেনে রেখো, কোনো মেয়েকে ভালো না বাসলে তার চরিত্র উপলব্ধি করা যায় না।

ও কি, চুপ চুপ—

ভয় নেই, দুর্নীতির দিকে ঘেঁষছিনে। আমি বলি, প্রেমই একমাত্র পথ, যে পথ দিয়ে মেয়েদের জানা যায়। নৈলে এমন মেয়েও দেখেছি, মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অথবা মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য—এ দুটোর কোনো স্তরেই সে মেয়েকে ফেলা চলেনা।—বলতে বলতে সোমেশ্বর আমার কৌতূহলময় চোখের দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর প্রশান্ত মদালস চক্ষু বন্ধ করলেন। গড়গড়ার নলটা আমি তুলে নিলুম।

সেই সময়টার কথা সম্ভবত তোমায় বলেছি, যে সময় একদা বিলাসের জীবন আমার অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখন মৃণাল চলে' গেছে, আমি বিবাহ ক'রে সংসারে মন দিয়েছি। মানুষ যখন একে একে তার সব কাম্যবস্তু পায় তখন ভাবপ্রবণ জীবনের ভয়ানক দুর্দিন—

বললুম, কেন?

যখন পাবার আর কিছু থাকে না তখনই বড় কিছু পাবার ব্যাকুলতা আসে, এটা বোঝ ত?

না।

সুখের শয্যায় শুয়ে যৌবনকালে আমার মনে কাঁটা খিচ্ খিচ্ করত। ছুটতুম পথে পথে। অশ্রান্ত উদ্বেগে ঘুরতুম দেশে দেশে। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছরের কথা হোলো।—এক চুমুক হুইস্কি পুনরায় পান করে' সোমেশ্বর বলতে লাগলেন:

তখনো আমার জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের পালা চলেছে, চোখে তখনো নিবড় ঔৎসুক্যের রঙ মাখানো, আজকের মতো সেদিন বহুদর্শনের অহঙ্কারে দুনিয়াকে করুণা করতে শিখিনি।

ট্রেনে চলেছি তীর্থের পথে। তীর্থকে উপলক্ষ্য ক'রে দেশে দেশে ভ্রমণের বাসনা। পথে বার দুই গাড়ী বদল করতে হয়। সেদিন বেলা অপরাহ্ন; প্রান্তরের পারে অস্তগামী সূর্যের কিরণে দিনান্তকালের আকাশ রঙীন হয়ে এসেছে। কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী থাম্‌ল, যাত্রীর ভিড় খুব, ভিতরে গোলমাল চল্‌ছে, বাইরে নানা কণ্ঠের আন্দোলনে স্টেশনটা তখন মুখরিত। গাড়ী অল্পক্ষণই থামবে। এমন সময় শোনা গেল বাইরে একটা হৈ চৈ! সমস্তটা জানবার চেষ্টা আমার ছিল না, কেবল বোঝা গেল প্লাটফরমের ভিড়ে একজন বৃদ্ধা ও যুবক কাকে যেন ব্যাকুল হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে। উচ্চকণ্ঠে কি একটা নাম ধরে' ডাকছে তারা। সেই অনুসন্ধানের চেহারাটা আজও মনে পড়ে। সাপ যেমন হারায় মাথার মণি, চক্রবাক যেমন খোঁজে তার সাথীকে, বন্য জন্তু যেমন পাগল হয়ে ফেরে তার হৃতশাবকের অন্বেষণে—তেমনি। স্থাণুর মতো বসে' দেখলুম মা আর ছেলের সেই উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। এমন সময় গাড়ী ছেড়ে দিল।

ট্রেন চলছে। অপরাহ্ন গেল গোধূলিতে, গোধূলি গেল সন্ধ্যায়। একটা অস্ফুট কোলাহল শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি, একখানা বেঞ্চের তলায় মাল-পত্রের জটলার ভিতর থেকে একটি যুবতা মেয়ে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। গাড়ীর ভিতরে পশ্চিমা এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। তাদের কারো পা, কারো বা জিনিসপত্র নির্বিবাদে ঠেলেঠুলে সরিয়ে মেয়েটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার এই রহস্যময় আত্মগোপন, এই চৌর্য-বৃত্তি ও দুরন্তপনা দেখে অনেকেই চঞ্চল হয়ে তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। বয়সটা তার ভালো নয়, চেহারাটাও তার নিরাপদে চলবার মতো নয়। অগণ্য লোলুপ এবং বুভুক্ষু দৃষ্টির উপর দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই প্রথমে আমার

চোখে পড়ল তার পরণে একখানা সরুপাড় ধুতি এবং মাথায় রাশীকৃত চুলের মাঝখানে চাওড়া সিঁদুরের দাগ,—যেন নববর্ষায় ঘনায়মান কালো আকাশ বিদ্যুৎবহ্নিশিখায় দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কোন প্রশ্ন এবং কোলাহলের দিকেই সে ভ্রূক্ষেপ করলে না, সমস্ত গাড়ীর ভিতরটায় চেয়ে চেয়ে এক সময় সকৌতুকে হেসে হঠাৎ আমাকেই তার কথা কইবার মানুষ বেছে নিল। বললে, এই যে বাঙালী পেয়েছি। মা আর দাদা চলে' গেছে কিনা জানেন ?—

সোমেশ্বরের মুখের উপরে বললুম, বিশ্বাসঘাতিনী, অসচ্চরিত্রা !

তিনি বলতে লাগলেন, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, ঢোক গিলে কি একটা উত্তর দেবার আগেই বেঞ্চের উপর দিয়ে টপকে মেয়েটা কাছে এসে বসল। তার হাতের তলায় ছিল সামান্য একটা বিছানা। গাড়ীর যাত্রীরা ভাবলো, আমি বুঝি বা তার পরিচিত মানুষ, নানা জটলা ও কানা-কানি করে' এক সময় তারা নিরস্ত হোলো। বললুম, মা আর দাদাকে পরের স্টেশনে গিয়ে খবর দিলেই ত হয়—একলা বিদেশে যাওয়া—

থামুন্।

তার ধমকে চুপ করতে হোলো। আমাকে থামিয়ে সে বলতে লাগল, এতবার পালিয়ে পালিয়ে কত দেশে ঘুরেছি তবু ওদের বিশ্বাস, একলা বেরুলে পথে-ঘাটে আমার বিপদ ঘটবে,—কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সরুন, বিছানাটা পেতে বসি।

বসবার জায়গা অতি অল্প, তবু জায়গা দিতে হোলো। অতি চঞ্চল তার চোখের চাহনি, কিন্তু সে-চাহনি কোন চটুলপ্রকৃতি নারীর নয়, সে চাহনি আধ পাগলের মতো অস্থির। বিছানা পেতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে' একহাতে মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলে। বার বার মুখের ওপর থেকে বাঁ-হাতে চুল সরিয়ে দেওয়া তা'র একটা মুদ্রা দোষ। বললুম, টিকিট করেছেন ?

থামুন। আমি ফাঁকি দেব না, কাছে অনেক টাকা আছে, টিকিট এক সময় করলেই হবে। তা ছাড়া হাতে এই বালা, গলায় রয়েছে মফচেন, ভাবনা কি?

টিকিট না করে উঠলে অকারণে বেশি আদায় করে নেবে!

আমার কাছে? থামুন, সব দেশের স্টেশন মাস্টাররা আমাকে চেনে। এই বলে' সে হাসল।

পরমাসুন্দরী নয়, কিন্তু সে রূপের চারিদিকে ছিল প্রবেশ নিষেধ। আপন ইচ্ছায় দুনিয়াকে চালিয়ে বেড়ায় এমন মেয়ে তুমি দেখেছ? তার মাথার সেই চওড়া সিঁদুরের দাগ শুধু যে সম্ভ্রম জাগায় তা নয়, মানুষকে তার কাছে অবনত করে, মনে মনে একটা ভয় এনে দেয়। তার চোখের ওপরে চোখ রাখা যায় না। জিজ্ঞাসা করলুম, কতদূরে যাবেন?

ঠিক নেই। দেখি না গাড়ীখানা কোন্‌দিকে যায়। আপনি যাবেন কোথায়?

বললুম, গৈবিনাথ।

গৈবিনাথ? ও, এই সময়েই ত সেখানে মেলা বসে,—চলুন, ওই দিকেই যাওয়া যাক্‌। হাঁটাপথ কিন্তু, হাঁটতে পারবেন, কষ্ট হবে না? পথে ভালো খাবার-দাবারও পাওয়া যায় না, ভারি বিশ্রী লাগে।

কথা বলার এই বেপরোয়া ভঙ্গী দেখে আমি আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলুম। এ-পাগলের সঙ্গে কি-কথা বলা চলে? মনে হচ্ছিল যদি কোথাও মতের মিল না হয়, তাহলে এখুনি অপমান করতেও এ-মেয়ে হয়ত দ্বিধা করবে না। উজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর মুখশ্রী, স্নেহলেশহীন রুক্ষ রূপ, বলিষ্ঠ দেহ—পাথর কেটে যেন সেই দেহ গড়া। মুখ তুলে তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে মুখে একটি ভীরুতা ফুটে ওঠে।

সকল কথা আজ তোমাকে বলতে পারব না, পুঙ্খানুপুঙ্খ মনেও নেই, আছে স্মৃতি, চিত্রটা নেই, আছে রঙ, জলে ধোয়া রঙ।—সোমেশ্বর

একটু থামলেন। গ্লাস নিয়ে এক চুমুক পান করে' পুনরায় বললেন ইসলামপুরের ঘাটে এসে গাড়ী থাম্‌ল। হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, মেয়েটির নাম চারুবালা। তার নাম যে চারুবালা একথা সে কথায়-কথায় অন্তত পঁচিশবার আমাকে জানাল। গাড়ী থেকে নেমে আমাকেই সে পথ দেখিয়ে যাত্রীশালায় নিয়ে এল। অনেক স্ত্রী-পুরুষ জমেছে। রাত কাটিয়ে সকালে উঠে সবাই ধরবে স্টীমার ; সকলের গতি গৈবিনাথের দিকে। লোকজনের হাত-পা মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে, এঁকে-বেঁকে যাত্রী-শালার একান্তে একটু নির্জন জায়গায় সে এসে থামল। এ যেন তার অভ্যাস, সমস্তটাই তার পরিচিত। নিঃশব্দে তার বিলি-ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। আমি তখন কেবলমাত্র অভিভূতই নয়, আপন ব্যক্তিত্বও হারিয়ে ফেলেছি। হারাবারই কথা, সেই রাত, আশে পাশে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার, যাত্রীশালার সেই ক্রম-বিলীয়মান কলরব, স্তিমিত আলো, তাদের মাঝখানে এসে সেই অজ্ঞাত-কুলশীলা রহস্যময়ী রমণীর অঙ্গুলিনির্দেশ,—জানিনে এরকম ঘটনা কা'রো জীবনে ঘটেছে কিনা।

জায়গাটা রাখবেন, আমি আসছি।—এই বলে' হাতের বিছানাটা আমার জিম্মায় রেখে চারুবালা একবার অদৃশ্য হোলো। কী অক্লান্ত সে, কী তার উদ্যম। ফিরে যখন এল, হাতে একরাশি খাবার। নিঃসঙ্কোচে দু'ভাগ করলে, এক ভাগ দিলে আমার দিকে এগিয়ে।

ওই যা, জল আনা হয়নি। দিন্ দেখি আপনার কমণ্ডলুটা ?

দেবার অপেক্ষা সে রাখলে না, হাত বাড়িয়ে কমণ্ডলুটা নিয়ে সে আবার জল আনতে ছুটল। জল এনে রেখে পরিষ্কার সহজ কণ্ঠে বললে, খাবারের দরুণ তিন আনা আপনি আমাকে দেবেন।—কোনো সঙ্কোচ, অকারণ চক্ষুলজ্জা এবং তথাকথিত সামাজিক সৌজন্য তার নেই।

গল্পের মাঝখানে বললুম, আর কেন সোমেশ্বর, বুঝতে পেরেছি সব। কি হবে তাও জানি। তোমার প্রেমের গল্পের আরম্ভটা মন্দ নয়।

তোমার ভুল ধারণা, সে রকম গল্পই নয়। শোনো। সে-রাত কাটল। ভেবেছিলুম একটু আলাপ করব, তার এই বাধাবন্ধহীন জীবনের আসল কথাটা শুনে নেবো কিন্তু সুযোগ পেলুম না। স্বামীত্যাগিনী মেয়েটা—অন্ততঃ তার সম্বন্ধে এই ধারণাই আমার হয়েছিল—সেই যে বিছানা পেতে শুয়ে চোখ বুজল, আর জাগল না, নিশ্চিন্ত নির্ভরতার পাশে শুয়ে অল্প-ক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডেকে উঠল।

প্রভাতে স্টীমার ছেড়ে বেলা ন'টা আন্দাজ পারের ঘাটে এসে লাগল। মাঝখানে চারুবালা একবার অদৃশ্য হোলো, স্টীমারে কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে ঘাটে নেমে এলাম। ঘাটে এসেও প্রথমটা পাইনি। তবে কি চলে' গেছে? ব্যাকুল চেখে চারিদিকে তাকাচ্ছি, এমন সময় দেখলুম, স্নান সেরে ঘাটের ধারে সে জপে বসেছে। যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কত-ক্ষণ পরে তার জপ শেষ হোলো। তারপর উঠে এসে সুমুখে আমাকে দেখেই সে বিস্মিত হয়ে বললে, একি, এখনো দাঁড়িয়ে যে? চলে' যাননি?

মাথার সেই চওড়া সিঁদুর জলে ধুয়ে আরো যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সকালের রোদ এসে পড়েছে মুখে। সুকোমল সে মুখশ্রী। বললুম, আপনারি অপেক্ষায়—

আমার অপেক্ষায়? ধৈর্য্য ত আপনার কম নয়? ব'লে হেসে চারুবালা সূর্যপ্রণামটা সেরে নিল।

বললুম, তাহলে আমি এবার যাই, আপনি আসবেন পরে।

থামুন, পাগলের ওপর রাগ করবেন না মেয়েমানুষকে আঘাটায় ফেলে রেখে স'রে পড়তে চান? কী করেছি আপনার?—ধরুন দেখি বিছানাটা, গরুর গাড়ী পর্যন্ত ব'য়ে নিয়ে চলুন।

বিছানাটা আমার হাতে গছিয়ে ভিজে কাপড়খানা হাতে নিয়ে স্তবপাঠ

করতে করতে সে আগে আগে চলতে লাগল। ভিজা চুলের রাশ থেকে টস টস ক'রে জল পড়ে' তার পিঠের কাপড়টা তখন সপসপ করছে। এবারেও সে সাড়ী পরে নি, পরেছে আর একখানা নরুণ পাড় ধুতি। তাকে অনুসরণ ক'রে চললুম। কিছুদুর এসে গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। কয়েক জন যাত্রী ইতিমধ্যেই উঠে বসেছে, বারোজন হলেই গাড়ী ছাড়বে। বারো জন হোলো কিন্তু গাড়ী আর ছাড়ে না। চারুবালা বকাবকি করতে লাগল। এমন চঞ্চল, এমন অধীর মেয়ে ভূভারতে দেখা যায় না। বাঁ হাত দিয়ে কপালে চুল সরায় আর হেসে হেসে সকলের সঙ্গে গল্প সুরু করে' দেয়। কয়েকজন পশ্চিমে স্ত্রী-পুরুষ তার পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় রসিকতা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। যেমন সহজ তেমনি সাবলীল। এক সময় নিজেই সে উত্যক্ত হয়ে ছইয়ের ভিতর থেকে নেমে পড়ল। চোখ রাঙা করে হিন্দি ভাষায় জানাল, চড়ব না তোমার গাড়ীতে, আমার সময়ের দাম আছে। পয়সা দিলে অনেক গাড়ী মিলবে।

ভিজে কাপড় আর বিছানা নিয়ে সে হন হন ক'রে চলতে লাগল। গাড়োয়ান ছুটল তার পিছনে পিছনে। অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে ভালো কথায় বুঝিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনল।

গাড়ী যখন ছাড়ল তখন সে কাপড়খানা ছইয়ের উপর টাঙিয়ে রোদের দিকটা আড়াল ক'রে দিল। বললে, কি দেখছেন হাঁ ক'রে, ভালো হয়ে বসুন।

ভালো মুখরা মেয়ের পাল্লায় পড়েছিলে ত সোমেশ্বর ?

শুধু মুখরা ? বাচাল বেয়াদপ। মাঝে মাঝে তার অমার্জিত অভদ্র মন্তব্য শুনে গায়ের রক্ত আমার আগুন হয়ে উঠেছিল। নিতান্ত তরুণী বলেই ক্ষমা করেছিলুম। নারীর মনের সহজ লাবণ্য আর সলজ্জতা তার বিন্দুমাত্রও নেই। এমন উদ্ধত, বেয়াড়া মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। শৃঙ্খলাহীন স্ত্রীলোক কী ভয়ানক। হ্যাঁ, ঘণ্টা দুই বাদে অষ্টভুজার মন্দিরের

ধারে এসে গাড়ী দাঁড়াল, এইখান থেকেই পাহাড়ি হাঁটা পথ। মন্দিরের কাছে প্রকাণ্ড এক আশ্রম, সংসারত্যাগী কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে তপস্যা করেন। চারুবালা নেমে এসে বললে, আসুন, দেখিয়ে দিই আপনাকে, এই আমার গুরুবাড়ী। স্বামীজিকে দর্শন ক'রে যাবেন?

বললুম, না আমি দাঁড়াই, আপনি ঘুরে আসুন।

এমন সময় একদল স্ত্রীলোক দেখেই সে তাদের মধ্যে ভিড়ে গেল। বললে,এই যে বলি কি গো সনতের মা, এই যে বড়পিসি,তোমরাও এসেছ দেখছি। যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে—ভাবলাম গুরুদেবকে একবার দর্শন করেই যাই। চলো।

স্ত্রীলোকগুলি পরস্পর হাসাহাসি করে বলতে লাগল, ওমা, কি হবে গো, পাগলি আবার কোথা থেকে উড়ে এল মা! সিঁদুর দিয়ে মাথাটা যে জুবড়ে রেখেছিস মুখপুড়ি? এখনো মতি-গতি ফেরেনি? ক'বছর হোলো?

একে একে সকল যাত্রী হাঁটতে হাঁটতে চল্‌ল, ধূলোয় আর রোদে আমি রইলুম দাঁড়িয়ে।

স্পষ্ট কথাটাই বলো না সোমেশ্বর।

স্পষ্টই বলব। সে যে কী আকর্ষণ, কী মোহ তা আর তোমাকে বোঝাতে পারব না! আমি তার জন্যে সব হারিয়ে দেউলে হয়ে গেছি। রোমান্স নয়, প্রেম নয়, একটা প্রবল ইল্যুশন, একটা দুঃস্বপ্ন।

আর দেখা পেলে না?

কিছুক্ষণ পরেই দেখা পেলুম। হতাশ হয়ে ভাবছি আর কেন, অনেক দূর পথ, এবার আস্তে আস্তে যাই। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে যা দেখলুম, তাতে আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি। ধর্মশালার দালানে বসে' চারুবালা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। যৌবনকালে স্ত্রীলোকের চোখের জল আমি সইতে পারতুম না, সমস্ত মন আমার মমতায় দ্রবীভূত

হয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললুম, কি হোলো এর মধ্যে? কাঁদচেন কেন?

আপনি যান্, আমি আর মুখ দেখাব না কারুর কাছে। ব'লে সে দালানে উপুড় হয়ে শুয়ে আবার ফুলে' ফুলে' কাঁদতে লাগল কিন্তু আমি কোথায় যাবো তাকে ফেলে? আমি তখন সব হারিয়ে বসেছি। চুপ ক'রে তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। অশ্রুতে অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে এক সময় সে বললে, আমাকে কোনো অনুরোধ করবেন না, আমি এইখানে জীবন দিয়ে প্রাচিত্তির ক'রে যাব। সবাই আমাকে অপমান করে আমি কি এতই হীন? গুরুদেবের অন্নসেবা হচ্ছিল, আমাকে ওরা দর্শন করতে দিলে না। আমি না হয় তাঁতীর মেয়ে। বেশ, আমি তাঁতী, আমি চণ্ডাল, আমি ডোম, আমি···

অঝোরে সে কাঁদতে লাগলো। আবেগভরে আবার বললে, আজ বুঝলুম, আমি ছোটজাতের মেয়ে, আমি হীন। তোমরাই বড়, তোমরাই মান্য।

বহু ক্ষেদোক্তির পর সে চোখ মুছে উঠে বসল। দু'একটা কথা বলতে গেলুম কিন্তু সে গ্রাহ্য করলে না। নিজের মনে উঠে জিনিষপত্র নিয়ে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে পথে নামল। মধ্যাহ্নের রোদ চারিদিকে তখন টা টা করছে। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সে নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগল।

শীতের শেষ। সুমুখের ছোট একটা পাহাড়ী নদী পার হতে হবে। নদীর ধারটি অতি শীর্ণ, সহজেই হেটে পার হয়ে গেলুম। নদীর পারেই পাহাড়ের পথ। চারুবালা আগে আগে কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম ক'রে গেল। পিছনে সে চাইল না, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো মূল্যই সে দিল না, অতএব তাকে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি আমার রইল না, আমি চললুম ধীরে ধীরে।

যাক্ তোমার ভূত ছাড়ল সোমেশ্বর।

হ্যাঁ, ভূতই ছেড়ে গেল। পাহাড়ের একটা বাঁকে বহুদূরে তার ক্রতগতিশীল লালায়িত মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছিলুম। সে অক্লান্ত চলেছে, কোথাও থামছে না, তাকে যেন পেয়ে বসেছে এক অবিরাম চলার নেশা। আমি তার কাছে হার মানলুম।

বললুম, এখানেই শেষ ত?

এখানে শেষ হ'লে ভালই হোতো। কিন্তু তা হয়নি। শেষটুকু সামান্যই, জলের মতো সহজ।—সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, সাত আট মাইল পাহাড় ভেঙে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক নদীর ধারে এসে পৌছলুম। শরীর ক্লান্ত, শীত ধরেছে। কাছেই ছোট একটা ধর্মশালা, কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা এত বেশি যে জয়গা সঙ্কুলান হয় না। নদীর ধারে কয়েকটা সরকারি তাঁবু পড়েছে, সেখানেও জায়গা নেই। এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্না করতে বসে গেছে। আগে ভাগে হলে হয়ত আশ্রয় জুটত। নদীর চড়াতেই রাত কাটানো সাব্যস্ত ক'রে কয়েক পা এগোতেই পাশের তাঁবুর ভিতর থেকে চারুবালার গলার আওয়াজ পেলুম।

এই যে, আসুন, আসুন, জায়গা পাননি বুঝি?—তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। এত দেরি হোলো আসতে? আহা, হাঁটা অভ্যেস নেই কিনা, ভারি কষ্ট পেয়েছেন, কেমন?

তার সাদর অভ্যর্থনায় ভীত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। যে মনে সে কাছে ডেকে নেয়, সেই মনেই সে অকারণে মানুষকে বিতাড়িত করে। বললুম, জায়গা হবে নাকি?

হতেই হবে, আসুন, নৈলে এই রাতে যাবেন কোথায়? এইটুকু তাঁবুতে কুড়ি জনের ওপর লোক। এই খুটিটার কাছে একটু জায়গা হয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা?

রান্না ক'রে নেবো।—ব'লে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলুম। ভিতরটা যেন

জন্তু বিশেষের খোঁয়াড়। কোনোক্রমে এক জায়গায় ঝোলাটা নামিয়ে বললুম, আপনার আহারাদি?

ওই যে, বাইরে মহারাজজী রান্না চড়িয়েছে।

মহারাজ আবার কে?

চারুবালা কলকণ্ঠে হেসে উঠে তাঁবুর ভিতরটা মুখরিত করে তুললে। বললে, নতুন বন্ধু। এমন সবিনয়ে পথের মাঝখানে আলাপ করলে যে, মেয়ে-মানুষের মন, তখুনি খুশী হয়ে গেল। বেশ ভালো, দুর্গম পথে সঙ্গে একটা পুরুষ মানুষ থাকা মন্দ কি? বলি ও মহারাজ?

তখন অন্ধকার হয়েছে। বাইরের খোলা জায়গায় যেখানে আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছিল সেখান থেকে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব এল, কেঁও জি?

চাওল্ বোল্‌তা হ্যায়?

জি।

আমার দিকে ফিরে হেসে চারুবালা বললে, কী নিঃস্বার্থ বন্ধু বলুন ত? এমন দেখেছেন কোথাও? জল এনে দিলে, রান্না ক'রে দিচ্ছে, পথে শুনিয়েছে ভজন গান, আমার সুখ-সুবিধের দিকে কড়া নজর, কিসে আমি খুশী হই···যান্ আপনি, আর দেরি করবেন না, চাল আর আলু এনে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিন, সারাদিন ত উপবাসেই কাটল আপনার।

হেসে উঠে গল্পের মাঝখানে বললুম, চারুবালা তোমার কত রঙ্গই জানে।

সোমেশ্বর বলতে লাগলেন, ধর্মশালার দোকান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে আনলুম। শীতের হাওয়ায় অন্ধকারে বাইরে থাকা এক ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু উপায় নেই, পেটের ক্ষুধাটা সমস্ত দুর্যোগকে তাচ্ছিল্য ক'রে জ্বলে' উঠেছিল। কাঠ এনে কয়েকখানা পাথর সাজিয়ে আগুন জ্বালবার চেষ্টা করলুম। উনুনটা ঠিক জুতসই করতে পাচ্ছিনে, কাঠ এত ঠাণ্ডা যে জ্বলতে চায় না। এ এক বিষম বিপদ। ইতিমধ্যে মহারাজের রান্নাবান্না হয়ে গেল, ভাত তরকারি নিয়ে সে ঢুকল তাঁবুতে।

এতক্ষণে হারিকেনের আলোয় তার চেহারাটা দেখলুম। বয়স তার পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে। মাথায় একমাথা টাক্, গলায় একটা তুলসীর মালা, মুখে দাড়ি গোঁফ, ছোট ছোট দুটো চোখ—গায়ের রংটাও তার গেরুয়ার মতো রাঙা! সযত্নে সে চারুবালার কাছে হাতের জিনিসপত্র নামাল, চারুবালা তখন কম্বল ও বিছানার মধ্যে অতি আরামে ব'সে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মধুরকণ্ঠে আলাপ করছে। মুখ তুলে এইবার সে বললে, মহারাজ, বাত্তি দে দেয়ো বাবুকো।

মহারাজ বললে, কোন্ বাবু?

আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে চারুবালা বললে, উয়া চাউল বানানে-ওয়ালে, বেচারাকো তক্‌লিপ হোতা হ্যায়।

মহারাজ অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে ফিরে বললে, তক্‌লিপ ত করনা চাই, তীরথওয়ালে, বাত্তি ম্যা ক্যইসে দেই, এত্‌না আন্‌ধরে—

তার প্রত্যাখ্যানে চারুবালা রাঙা হয়ে উঠল রেগে।—মুখে আগুন তোমার, ইতর কোথাকার।—ব'লে সে কম্বল ও বিছানা ছেড়ে বাইরে এল, আমার হাত থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে বললে, সরুন, অকম্মার ঢিপি আপনি, এমনি ক'রে উনুন তৈরি করে? কাঠের আগুন জ্বালতে জানেন না, কী জানেন তবে?

তিন চারখানা পাথর সাজিয়ে অতি সহজেই সে উনুন তৈরি ক'রে আগুন জ্বাললে। বললে, যার কাজ তারেই সাজে। পুরুষ মানুষ কি আর রান্না ক'রে খেয়েছে কোনোদিন?

ভাতের হাঁড়িটা সে উনুনে চাপিয়ে দিল।—তখন বললুম, তরকারি কিছু করবেন না?

মুখের ওপর চারুবালা ধমক দিল। থামুন, তরকারি! ভারি লোভ যে আপনার! বলে, বসত পেলে শুতে চায়। ভাতে-ভাতেই হয়ে ওঠে না, আবার তরকারি!

অপমানে ইচ্ছে হোলো তখনই আত্মহত্যা করি। কিন্তু তারপরই হেসে চারুবালা বললে, লোকটার কী হিংসে দেখলেন আপনার ওপর? আলোটা দিলে না।

বললুম, হিংসে কেন? কী করলুম ওর?

ভারি ন্যাকা আপনি। ব'লে সে ফুঁ দিয়ে কাঠ জ্বালিয়ে দিল। আলোয় দেখলুম, কাঠের ধোঁয়ায় ইতিমধ্যে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে, জল পড়ছে। ছোট ছোট সাহায্য সে যে কত কর্‌লে সে রাত্রে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

সবাই পাশাপাশি বসে, আহারাদির কার্যটা চলছিল। সেই সময় আলোটা আড়াল ক'রে মহারাজের অলক্ষ্যে চারুবালা কেমন ক'রে খানিকটা তরকারি হঠাৎ আমার থালায় তুলে দিয়েছিল তা আমি আজো মনে করতে পারি। মেয়েদের মন আশ্চর্য, নিতান্ত নিস্পর হলেও পুরুষের আহার সম্বন্ধে তাদের একটা বিশেষ কৌতূহল।

এবার বললুম, এটা তোমার আত্মবঞ্চনা সোমেশ্বর। তুমি নিশ্চয় জানতে পেরেছিলে, ততক্ষণে তোমার সঙ্গে চারুবালার একটা আপত্তিকর সম্পর্ক—

না—সোমেশ্বর বললেন, শোন; খাওয়া-দাওয়ার পর নদীতে বাসন ধুয়ে দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে যখন তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকলুম তখন বেশ রাত। পথশ্রান্ত যাত্রীরা কেউ জেগে নেই। শুয়েছে সবাই পাশা-পাশি। চারুবালার কাছে মহারাজ। টাক্‌পড়া সে মাথাটা এনেছে চারুবালার বিছানায়; লোকটা যেন হাত পেতে স্নেহ-মমতা ভিক্ষা করছে। চারুবালা সেটা লক্ষ্য ক'রে আমাকে বললে, এই টেকো বুড়ো কত গল্পই করলে আমার কাছে, বুঝলেন? বৌ ম'রে যাবার পর থেকে সন্নিসি হয়েছে, অনেক দেশ ঘুরেছে, কিন্তু জীবনে আমার মতো মেয়ে নাকি দেখেনি, এই সব।

তার কথা শুনে মহারাজ মাথা তুলে বললে, কেয়া বোল্‌তা?

চারুবালা একহাতে তার মাথাটা সরিয়ে দিয়ে বললে, বল্‌ছি যে চুল পাকলেই পুরুষ মানুষ বোকা হয়। বুঝতে পেরেছ গর্দভ ?

মহারাজ খুশী হয়ে আবার চোখ বুজল। চারুবালা আবার বললে, বুড়ো হয়েছে তবু মেয়েমানুষের ওপর কী টান দেখছেন ?—তোমার আর কিছু হবে না বাবা, সন্নিসি না ছাই। ইচ্ছে হচ্ছে তোমার গলা টিপে রাতারাতি শেষ ক'রে রাখি। আচ্ছা, মহারাজ ?

মুখ তুলে হেসে মহারাজ বললে, কেয়া ?

চারুবালাও হেসে বললে, দেখুন দেখুন, আমার মাথা খান, এবার এর লোলুপ চেহারাটা একবার দেখে নিন্; যেন বুনো ওল্। মুখে কি ক্যাংলামো দেখেছেন ? এরাই আসে ধর্ম করতে। হায় রে ধর্ম ! মহারাজ, তোমাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত জানো ?

মহারাজ বোকার মতো অতি আনন্দে মাথাটা উঁচু ক'রে তাকালো। সত্যি বলছি তোমাকে, চারুবালার চোখ দুটো তখন দপদপ ক'রে জ্বলছে, তবু সে হাসি মুখেই বললে, মনে ক'রো না ঘেন্নায় উঠে স'রে যাবো তোমার কাছ থেকে, সে মেয়েই আমি নই। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো ? —গরম সাঁড়াশি দিয়ে তোমার চোখ দুটো উপড়ে ফেলতে। সাপের গর্তে আঙুল দিও না বাবা, দরকার হ'লে তোমার বুকের ওপর ব'সে নখ দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নেবো, বুঝলে বন্ধু ?

তাঁবুর ভিতরে সেই স্তিমিত আলোয় চারুবালার চেহারা দেখে আমার গা কেঁপে উঠল। বললুম, ও একটু প্রশ্রয় পেয়ে অমনি করছে, আপনি না হয় একটু সরে যান্ না ?

থামুন আপনি, ঠিক এমনি করেই শোবো আমি, ভয় কিসের ? সারারাত ও দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় জেগে থাকবে, আর আমি নাক ডাকাবো। —ব'লে চারুবালা চেপে শুলো।

বাইরে অন্ধকার, শীতার্ত রাত্রি সাঁ সাঁ করছে। নদীর ওপারে গভীর

বন, সেই বনে বাতাস উঠে ঝড়ের মতো শব্দ আসছে, তার সঙ্গে নদীর ঝর ঝর কলতান। যাত্রীদের কলরব নীরব হয়ে এসেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটাবার পর চারুবালা বললে, আপনার শোবার কষ্ট হচ্ছে, আমার বিছানাটা দেবো ?

আবার সেই শাঁখের করাত। হাঁ, না কিছুই বলতে পারলুম না, চুপ ক'রে রইলুম।

ঘুমোলেন নাকি ? চারুবালা উষ্ণ হয়ে বললে, এমন ঘুম ত কোথায় দেখিনি বাপু ?

এবার গল্পটা বোধ হয় অসৎপথে চলবে। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, কি হবে বোঝাই যাচ্ছে। আচ্ছা, আজকের মতো উঠি সোমেশ্বর।

শেষটা শুনে যাও ?

শেষ ত এর জানাই আছে। তোমার যুবককালের গল্প কোথায় গিয়ে শেষ হয়, তা ত জানি।

তবু শুনে যাও শেষটা।—ব'লে সোমেশ্বর হুইস্কির অবশেষটুকু পান করে নিয়ে আবার চোখ বুজলেন। তারপর পুনরায় সুরু করলেন।

সাহস হচ্ছিল না তার কাছে কিছু নেবার। বললুম, বিছানা চাইনে, এইতেই হয়ে যাবে।

চারুবালা বললে, আমার বিছানাটা দেখেছেন ত ? একটি ছোট বালিশ, আর অড়-পরানো একখানি কাঁথা।

বললুম, কম্বল নেই ?

না, এ দুটি ছাড়া আর কিছুই আমি ব্যবহার করিনে। কি শীত, কি গরম,—এই কাঁথা আর বালিশ। আজ ন' বছর এই দুটি আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।—দু'হাতে ভর দিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে মাথাটা সে তুললে। স্তিমিত দীপালোকে তার মাথার চওড়া সিঁদুরের দাগটা জ্বল জ্বল করছে।

মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সে বললে, আপনাকে বিছানাটা দিতে চাইলাম বটে কিন্তু দিতাম না, এ বিছানায় আমি কাউকেই শুতে দিইনে। কেউ এর যোগ্য নয়।

এবার সুযোগ পেয়ে বললুম, আপনার স্বামী কোথায় ?

চারুবালা কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে, নেই।

নেই মানে ?

জানতে যদি চাইলেন তবে বলেই ফেলি—বলতে বলতে চারুবালার এতক্ষণকার গলার স্বর কেমন ক'রে যেন অকস্মাৎ অস্বাভাবিক রকম বদলে গেল। বলতে লাগল, সে অনেক কথা। আমার বয়স তখন আঠারো। বাপের বাড়ী থেকে আসছিলাম শ্বশুর বাড়ী। শ্বশুর বাড়ীর দরজায় পা দিতেই শুনলাম, আমার স্বামী মারা গেছেন আগের দিন। একি হয় কখনো ? সুস্থ মানুষ রেখে গেলাম, জলজ্যান্ত মানুষ, সে যাবে ম'রে ? মরা কি এতই সহজ। সত্যি বলব আপনাকে, আমি সেদিন পাগল হয়ে গেলাম। সে মরেনি, তার মরবার কথা নয়,—চব্বিশ বছরের ডাকা-বুকো ছেলে সে,—চারুবালা উত্তেজিত আবেগে সহসা বিছানা ছেড়ে উঠে বসল; বললে, যদি সে মরবেই, আমার কোলে তার মরণ হোল না কেন ? তখনই ছুটলুম তার সেই মৃত্যুর পিছনে, যমের হাত থেকে তাকে ফিরিয়ে আনব। মন্ত্র পড়ে' বিয়ে হয়েছিল, সে মন্ত্র কি এত বড় মিথ্যে ! তাকে আমি ফিরে পাবই, একদিন না একদিন তাকে ধরে' ফেলবই।

সেদিন কী রহস্যময় অন্ধকার রাত। তুমি কখনো দেখেছ, সতীনারীর আত্মপ্রত্যয়ের চেহারা কেমন ? ভিতরের তেজ বাইরে আসে কেমন জ্যোতির্মণ্ডল হয়ে ?

ফিরে পাবই একদিন।—এই কথা বলতে বলতে চারুবালা আবেগে কাঁপতে লাগল। চোখে এল তার স্বপ্নলেখা, কণ্ঠে এল গান, রূপ হোলো

অপরূপ। সেদিন তাকে পাগল বলিনি, বিশ্লেষণ করিনি, তাকে নিবিড় ক'রে অনুভব করেছিলাম। সে আবার বললে, ন' বছর কাটল তাঁকে খুঁজে খুঁজে। এই বিছানা তাঁর, এই দেহ তাঁর, আমি তাঁর, আমার যা কিছু···আমাকে ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন বলুন ত? কত দুঃখে আমার দিন কাটে, কত বিপদে···তিনি নির্দয়, আজো তাঁর দেখা নেই। —বলতে বলতে তার চোখে ঝরঝরিয়ে জল এল।

অবাক্। ভাবের স্রোতে ভাসা মেয়ে, কূল কি পাবে কোনোদিন? চোখ মুছে বললে, সমস্ত জীবন ধ'রে লোকের ভিড়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াবো। পাব না তাঁকে, ধরতে পারব না, বলুন ত আপনি?

সোমেশ্বর চুপ ক'রে গেলেন।

বললুম, তারপর?

তারপর সকাল হোলো। ঘুম ছাড়িয়ে আমি আর মহারাজ উঠে ব'সে অবাক হয়ে দেখলুম, তাঁবুর মধ্যে কেউ কোথাও নেই। যাত্রীর দলের সঙ্গে চারুবালা ভোর রাত্রেই পালিয়েছে আমাদের ছেড়ে।

ব্যস্ত হয়ে বললুম, আর দেখা পাওনি?

প্রশান্ত দৃষ্টিতে সোমেশ্বর বললেন, না।

উঠে দাঁড়িয়ে লাঠিটা হাতে নিয়ে যাবার সময় বললুম, পাগল, পাগল, উন্মাদ মেয়ে তোমার চারুবালা। তাঁতীর রক্ত তার শরীরে, তাই হয়ত আজো বুন্‌ছে সেই ইন্দ্রজাল।

ভারাক্রান্ত মনে সেদিন আমি বেরিয়ে এলুম সোমেশ্বরের ওখান থেকে।

* *

*

ঠিক মৃত্যুর দিন আমরা গণনা করিনে। আমি আর সোমেশ্বর বসে' আছি একটা যুগের ইতিহাস নিয়ে। এক একটি দিন আমাদের এক

একটি সমস্যা। এই জীবনে অর্থাৎ আমাদের এই বার্ধক্যটা নিজেদেরই ভালো লাগে না। সোমেশ্বর সেদিন বলছিলেন, বুড়ো হলুম বটে কিন্তু মনের ভিতরে বার্ধক্য আসে না কেন? কেন মহাকালের খরচের খাতায় অসময়ে আমাদের নাম ওঠে?

কেন ওঠে তা জানি। সংসার থেকে আমাদের দরকার ফুরিয়ে গেছে। মহাকালের বিচারে জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য বেশি। ভোগের অধিকার ততদিন, যতদিন আমাদের সৃজনী শক্তি।

তামাকটা পুড়ছে। মুখোমুখি দু'জন বসে আছি। অনেকদিন পরে আজ একটু অধ্যাত্মবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করবার চেষ্টা করছিলুম। এ দুটো বিষয়েই আমাদের জ্ঞান কম তাই এ দুটো নিয়ে প্রায়ই নাড়াচাড়া ক'রে থাকি।

সোমেশ্বরের পাড়ায় ধনী ও সুশিক্ষিত গৃহস্থের বাস। আলোকপ্রাপ্ত সমাজ সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ শ্রদ্ধা এই জন্য যে তারা হৈ চৈ ক'রে আলোকের পথে আনাগোনা করে না। তাদের যা কিছু সব নিঃশব্দ অন্ধকারে। আজ এরই ব্যতিক্রম ঘটতে দেখে মুখ তুলে বললুম, কিহে, পাশের বাড়ীতে আজ যেন একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে মনে হয়?

সোমেশ্বর বললেন, সেই একই গল্প।

থাক্, শুনতে আর চাইনে। উত্তেজনাটার কারণ কি?

সোমেশ্বর হাসলেন। নিজের প্রশ্নে আমি নিজেই লজ্জিত হলুম। চুল পাকবার পর থেকে সংযম এসেছে বটে কিন্তু পরচর্চার দিকে মন মাঝে মাঝে লালায়িত হয়ে ওঠে কেন তা বুঝতে পারিনে। শেষ বয়সের অবসর প্রাপ্ত জীবনে মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলো মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। এই জন্যই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা ছোটে তীর্থের পথে; ধর্মসঞ্চয়ের জন্য নয়, ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্যও নয়, আত্মশুদ্ধির অভিসন্ধিতে।

সোমেশ্বর বললেন, স্বামী-স্ত্রীর কলহ।

থাক্ শুনতে চাইনে। ব'লে নিতান্ত ঔৎসুক্য সহকারে তাঁর মুখের দিকে যখন তাকালুম, পাশের বাড়ীতে তখন রীতিমত আন্দোলন সুরু হয়েছে। সেই দিকে পরম কৌতূহলে কিয়ৎক্ষণ কান পেতে রেখে বললুম, এমন ত আমাদেরই ঘরে হয় হে।

তোমরা অশিক্ষিত এবং অজ্ঞান তাই গলা ফাটিয়ে তোমরা বিবাদটা দেশ-দুনিয়ার কানে তোলো। যারা শিক্ষিত এবং ভদ্র তারা ওটা চুপি চুপি সারে।

তবে ?—ব'লে পাশের বাড়ীর দিকে তাকালুম।

বোধ হয় বিশেষ কিছু একটা ঘটেছে আজ। তোমাকে সেদিন বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলুম। এক ছোক্‌রা ডাক্তার আর তাঁর স্ত্রী থাকেন। মেয়েটির নাম প্রভা, নিজেই তিনি মোটর ড্রাইভ করেন। স্বামী-স্ত্রীর বৈঠকে আড্ডা মন্দ জমে না। অনেক মেয়ে-পুরুষ ভক্ত আসেন পরস্পরের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে, ব্রিফ্‌লেস্ ব্যারিস্টাররা আসে দু'এক পেগ হুইস্কি টান্‌তে—

থাক্ সোমেশ্বর, ও আর ভালো লাগে না।—ব'লে চ'লে যাবার যে ভাণটা করলুম সেটা সোমেশ্বরের দৃষ্টি এড়াল না। বৃদ্ধ ব্যক্তির কৌতূহলী কর্ণ ও তার আত্মবঞ্চনার চেহারাটা সোমেশ্বরের বোধ হয় জানা আছে। তিনি বললেন, গল্প আর বলছিনে, কেবল ওদের ঝগড়ার কারণটা ব'লে রাখি। ছোক্‌রা ডাক্তার মাঝে মাঝে দেখতে পান অতি প্রত্যূষে শ্রীমতী মোটর নিয়ে বেরিয়ে চ'লে যান্, ফেরেন অনেক বেলায়।

কোথায় যান্ ?

ভিক্‌টোরিয়ার বাগানে।

কেন ?

সোমেশ্বর বললেন, সন্দেহটা সেইখানেই। স্বামীর অশান্তির কারণ ঘটে।

থাক্ আর শুনতে চাইনে সোমেশ্বর। মেয়েরা আসলে ছেলেদের চেয়ে অনেক সাহসী। ব'লে লাঠিটা নিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াবার চেষ্টা করতেই বাধা পেলুম। একটি ছোক্‌রা দালানের উপর দিয়ে উঠে এসে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকল। রুদ্ধ-নিশ্বাসে বললে, কাকাবাবু, আপনাকে একবার যেতেই হবে আমার ওখানে, এর একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আমার অনেক বদ্‌নাম, অনেক ইন্‌স্যল্ট হয়েছে—

সোমেশ্বর সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, আচ্ছা ক্ষমা করতে পার না ডাক্তার?

ক্ষমা করা কি এতই সহজ কাকাবাবু? আপনি যদি জানতেন স্ত্রী হয়ে আমার প্রতি কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা উনি করেছেন—বল্‌তে বল্‌তে রুদ্ধ-নিশ্বাসও ডাক্তারের রুদ্ধ হয়ে এ'ল,—ক্ষমা করা এত সহজ নয় কাকাবাবু, আমি কি না করেছি ওঁর জন্যে!

সোমেশ্বর বললেন, জানো ত ডাক্তার, মানুষের মনকে কিছুতেই বাঁধা যায় না, তার গতির পথ আশ্চর্য রকম আলাদা।

ডাক্তারের চোখ দিয়ে বোধ হয় জল পড়ছিল। সোমেশ্বর পুনরায় বললেন, সেই রমেশ ছোক্‌রার কথাই বল্‌ছ ত? কিন্তু আমি এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখছিনে ডাক্তার, মেয়েদের ইচ্ছার স্বাধীনতা যদি না মেনে নিই তবে শিক্ষার বড়াই যেন না করি। তুমি কি বলো হে?

আমি এবার এগিয়ে এলুম। বললুম, উপদেশ দেওয়া ত সহজ কিন্তু সহ্যশক্তি মানুষের অতি সামান্য। তার চেয়ে আমি বলি ভালো আবহাওয়ার মধ্যে ওদের থাকা দরকার। ওরা গিয়ে 'সুনীতি সঙ্ঘের' মেম্বার হোক্।

সোমেশ্বর বললেন, তুমি কি মনে করো তোমার 'সুনীতি সঙ্ঘ' মানুষের সহজাত প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারবে?

তা না পারুক, কিন্তু এরা স্বামী-স্ত্রী যদি 'সুনীতি সঙ্ঘের' সভ্য হয় তাহলে অন্তত এদের পারিবারিক কলঙ্কের কথাটা কেউ আর বিশ্বাস করবে না। ভাবছি আমরাও দু'জনে গিয়ে ওখানকার সভ্য হবো।

সোমেশ্বর হেসে ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

জহুরীর জহর

শেফালী হইতে শিউলী। তাহার পর দেখিতে দেখিতে হইল শিলি! যাহারা নূতন মানুষ, নামটা শুনিয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চায়ি করে। নামের কোনো মাথামুণ্ড নাই, তাই বোধ করি ইহার ইংরাজি অর্থটাই মানায় ভালো।

শিলি বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহ আর না দিলেই নয়। অত বড় মেয়ের দিকে আর চাওয়া যায় না। মানে, যখন চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে তখনই চাহিতে নিষেধ। আত্মীয় স্বজনের ভিতরে কুমারী যুবতীর আদর নাই, কারণ, তাহার দিকে চাওয়া যায় না, অর্থাৎ, চাহিয়া দেখিলে পাছে মন খুশী হয়, সেজন্য চক্ষুকে সতর্ক পাহারায় রাখা।

শিলির বিবাহের কথাটা পাকা হইয়া উঠিতেছে, কারণ, বি-এ পাশ করিবার পর তাহার মা হওয়া ভিন্ন আর কাজ নাই। তাহার চেহারার এপিঠ ওপিঠ মা হইবার দিকেই ঘেঁষিয়াছে, ইহার পর দেরী করিলে লক্ষণগুলি শুকাইতে থাকিবে। মেয়েদের যৌবনটা কাজের চেয়ে প্রয়োজনের পথ ধরিয়া চলে। ফুল ফুটিয়াছে, ভোমরাকে ডাক দিয়া আনো।

ঘটক আসিয়া জানাইল, পাত্র প্রস্তুত। বিলাতের জাহাজ হইতে বোম্বাইতে নামিয়া দেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। হৃষ্টপুষ্ট, অল্পবয়স, ধনীর সন্তান। অমন পাত্রকে ফেলিলে ভবিষ্যতে দুঃখ আছে। গণ, কুল, শীল, গোত্র···কোথাও অমিল নাই। ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ার। নাম

শচীশ। বয়স ছাব্বিশ। ঘটক তাহার ফটো দেখাইল। অপছন্দ হইবার মতো চেহারা নয়।

হাজার দশেক টাকার বেশী লাগিবে না। শিলির বাবা রাজি হইলেন।

ছোট পিসিমা শিলিকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। খুব আয়োজন ও ঘটা করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভূমিকা করিয়া বলিলেন, এবারে আপত্তি করলে আর শুন্‌বো না শিলি।

কে শুন্‌তে বলছে তোমাদের ?—শিলি কহিল।

পছন্দ হয়েছে ত ? বল্‌ ?

শিলি হাসিয়া দিল। তারপর সমবয়সী পিসিমার গলা ধরিয়া কহিল, শাঁখ বাজিয়ে দাও।

ছোট পিসিমা কহিলেন, আমিও তাই বলি। বি-এ পাশের পড়াটা কেবল সৎপাত্রের জন্য অপেক্ষায় থাকা।

শিলি কহিল, না গো পিসি, না। ডিগ্রিটা হচ্ছে একটা অলঙ্কার। পরলে চক চক করে, মানায় ভালো। তারপর আর কি, বইগুলো ধ'রে দিয়েছি উইপোকার মুখে, কেটে ফেলুক।

ছোট পিসিমা তাহার এলো খোঁপাটা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ ইহা মেয়েমানুষেরই কথা, গ্রাজুয়েট্ মেয়ের কথা নয়।

শাঁখ বাজিতে দেরী ছিল কিন্তু আয়োজন চলিতে লাগিল। পাত্র-পক্ষের নিকট খবর গেল, দেনাপাওনার আলোচনাটা প্রায় মিটিয়া আসিল। বাবা পাত্র দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিলেন। ও-পক্ষের স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া পাত্রী দেখিয়া ভূরি-ভোজন করিয়া গেল।

বিলাত ফেরৎ পাত্র হইলেও বিলাতী ফ্যাশনটা সঙ্গে আনে নাই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য যে, শচীশ বাংলা ভাষায় কথা বলে, এবং গুরু-জনদের সম্মান করে। তাহার প্রসঙ্গ শুনিয়া শিলি ভাবিল, লোকটা

স্বদেশী চাল চালিয়া প্রশংসা আদায় করিতেছে ; যথাসময়ে শাসন করিলেই চলিবে।

বরপণ ছাড়াও অলঙ্কারের কথাটা আছে। একটি মাত্র মেয়ে, সুতরাং কার্পণ্য করিবার কোন কারণ নাই। অলঙ্কার নির্মাতাগণের নিকট অর্ডার গেল। যাহারা মণিমুক্তা লইয়া কারবার করে তাহাদের ডাক পড়িল। নানা জনে নানা উপহার দিবে।

রতিপতি রায় কোম্পানীর লোক আসিল। তাহারা জড়োয়া ও জহরতের কারবার করে। কলিকাতায় তাহাদের যথেষ্ট নাম। তাহাদেরই প্রতিনিধি স্বরূপ একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল।

ছেলেটির বয়স অল্প। তাহার লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া মাকড়া চুলে যেমন তেলও নাই, তেমন চিরুণীও কোনোদিন পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রংটা শাদা, মুখের কাটুনিটা অনেকটা মেয়েলি ছাঁদের, কেমন একটা অদ্ভুত লাবণ্যে তাহার মুখ চোখ কোমল! বড় বড় কালো দুইটা তারার উপরে ঘন কালো পল্লব। এক মুখ পাণ খাইয়াছে, জামার কাপড়ে ও চিবুকে সেই পাণের রস পড়িয়া রাঙা হইয়া আছে। শার্টের কলার এলোমেলো। তাহাকে দেখিয়া রাগ হয়, স্নেহ হয়। ছেলেটা বর্বর, কিন্তু সুন্দর।

পরণে তাহার জরিপাড় দামী শিমলার ধুতি, কিন্তু বেশ বুঝা যায় অসাবধানে পথে কোথাও ছিঁড়িয়া আসিয়াছে ; পায়ে মখমলের জুতা, কিন্তু অযত্নে তাহাও জরাজীর্ণ।

শিপ্রি কটুকণ্ঠে কহিল, খাঁটি জিনিস এনেছ ত ?

ছোক্‌রা পাণ চিবাইতে চিবাইতে হাসিল। যেমন অসভ্য তাহার চাল চলন, তেমন সুন্দর তাহার মুখশ্রী। বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, জহরতের কারবার না করিয়া সিনেমায় গিয়া অভিনয় করিলেই তাহাকে ভালো মানাইত।

ছোট পিসি কহিল, তুমি এত ছেলেমানুষ, তোমার হাতে যে কোম্পানী বিশ্বাস ক'রে জিনিস পাঠালে ?

ছোকরা কহিল, ছেলেমানুষ কি গো ঠাকরুণ, আমি খুব গুণী লোক।

সবাই হাসিয়া উঠিল। কাঁচা বয়সের মুখে পাকা রসিকতা শুনিলে পুরুষরা চটিয়া যায়, মেয়েরা খুশী হয়।

ছোকরা পুনরায় কহিল, বিশ্বাস করবে না কেন, আমি যে কোম্পানীর এক অংশের মালিক!

এ বুঝি তোমার বাপের কারবার ?

একটা কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে পাণ ও সুগন্ধী জরদা বাহির করিয়া ছোকরা মুখে পুরিল, তারপর কহিল, না ঠাকুরদাদার।

ছোট পিসি কহিল, তোমার নাম কি ?

রমাপতি রায়। বলি, কা'র বিয়ে হবে ? তোমার বুঝি ?

ছোট পিসি একটা ধাক্কা খাইয়া সরিয়া গেল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যে বালবিধবা একথা ছেলেটি বুঝিতে পারে নাই। শিলি মুখ ঝাম্টা দিয়া কহিল, যে-কাজে এসেছ সেইদিকে মন দাও, পরের ঘরের কথা কেন ?

রমাপতি কহিল, তোমার বিয়ে বুঝি ?

থামো, জানিনে।

রমাপতি হাসিল। কহিল, আমার ঘরের কথা শুনবে আর তোমাদের কথা জানতে চাইবো না কেন ?

তাহার যেন কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, সে পাণ মুখে করিয়া চিবাইতে অস্থির। দেখিয়া মনে হয় অনেকদিন স্নান করে নাই, শীতের হাওয়ায় হাতে পায়ে ধূলা ও ময়লা জমিয়া উঠিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া অসভ্যের মতো হাত পা দোলাইতে দেখিলে মনটা তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠে।

ছোট পিসি কহিল, বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে অমন ক'রে কথা বলে না। তুমি লেখাপড়া করেছ কতদুর ?

সামান্য।—রমাপতি কহিল, ম্যাট্রিক পর্যন্ত। পাশ করতে পারিনি। পরীক্ষা দেবার আগে সিঙ্গাপুর পালিয়ে গিয়েছিলুম।—বলিয়া নিজের আনন্দে সে হাসিতে লাগিল।

তাহার চোখের ভিতরে প্রাণের কেমন একটা অদ্ভুত আলো ঝলমল করিতেছিল, জীবনের একটা বিচিত্র নিবিড় নেশায় সে সর্বক্ষণ টলমল করিতেছে। তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিবার কৌতূহল যেমন অপরিসীম তাহার সহিত কথা বলিতে গেলেও তেমনি ভয় করে। কি জানি, বেপরোয়ার মতো কোন্ কথাই বা বলিয়া বসে।

এমন সময় বঙ্কিমবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমাপতি উঠিয়া নমস্কার করিল না দেখিয়া শিলি আহত হইল; তাহার এই ত্রুটি শিলি যেন নিজেরই লজ্জা বলিয়া মনে করিল! ইচ্ছা হইল, এই সামান্য সৌজন্যটুকু সে ওই ছেলেটাকে শিখাইয়া দেয়।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কি চল্‌তে পারে ?

রমাপতি কহিল, পারে বৈ কি, আমিই ত মালিক। বলিয়া সে কোটের ভিতরের পকেট হইতে এক গোছা শাদা মুক্তার মালা বাহির করিল।

সকলে মিলিয়া সেগুলি যখন নাড়াচাড়া করিতেছে, শিলি তখন রমাপতির দিকে তাকাইল। রমাপতি তাহার দিকে চোখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বেশ মানাবে।

বঙ্কিম কহিলেন, কা'কে ?

আপনার মেয়েকে। ভাল চেহারা কিনা, এই বেশ খাট্‌বে! এই দেখুন না, এর ভেতর থেকে আভা ফুটছে নীল, এর আশ্চর্য

গুণ। রোদে রাখুন, দেখবেন রামধনুর রং—অন্ধকারে নিয়ে যান দেখবেন আলো বের হচ্ছে। এ'টার দাম বেশি নয়।

কত?

বারো শ' টাকা। এটা নেবেন? এই যে, এর রং সোনার মতন। বিকাল বেলায় পরলে মনে হবে এর মধ্যে জল টলটল করছে। সকালের আলোয় দেখতে পাবেন দুধের মতন শাদা। যারা নতুন বৌ হবে এটা পরলে তারা বরের ভালোবাসা পায়।

ছোট পিসির সহিত শিলি মুখ রাঙা করিয়া মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল। ইহার মুখের সম্মুখে দাঁড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়। বঙ্কিমবাবু কহিলেন, জিনিস বেচতে হ'লে তোমাদের এই সব কথা বলতে হয় নাকি হে?

সত্যি কথা—রমাপতি বলিতে লাগিল, মুক্তো হাতে নিয়ে মিছে কথা বল্‌ব আপনার কাছে? আমি সাধারণ খদ্দেরের কাছে আসিনে মনে রাখবেন। নেটিভ প্রিন্সদের ঘরে আমার কাজ। তারা দু' হাজার চার হাজার টাকার মাল নেয় না। ভালো জিনিস নিয়ে গেলে তারা গররাজি হয়েও পঞ্চাশ হাজারের মাল কেনে। পাতিয়ালা আর বিজানগরকে আমি এই সেদিন পাঁচ লাখ টাকার মাল গছিয়েচি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আমি ত আর অত দামের জিনিস কিন্‌তে পারবো না।

কেন, আপনি ত বড়লোক!

বঙ্কিমবাবু হাসিলেন। কহিলেন, পরের টাকা সবাই বেশি ত্যাখে। আরে, এ যে আমার কন্যাদায়। সোনার জিনিসের কিছু কাজ আছে তোমার কাছে?

আছে বৈ কি। বলিয়া রমাপতি অন্য পকেট হইতে দামি পাথর বসানো সোনার টায়রা বাহির করিল।

শিলি দরজার বাহিরে গিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার পুনরায় ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি কহিল, বসুন। আপনারই ত এখন জয় জয়কার। কত গয়না, কত মণিমুক্তো, আপনার এখন অনেক দাম।

'তুমি' হইতে আবার 'আপনি' হইল। ছেলেটার বোধ হয় মাথার দোষ আছে। কিন্তু কিছু না বলিয়া চেয়ারখানা একটু দূরে টানিয়া বাবার পাশে গিয়া শিলি বসিল।

বঙ্কিমবাবু কহিলেন, তা যেন হোলো, শিলির এখন খুব দাম বুঝলুম, কিন্তু তুমি এত দামী জিনিস নিয়ে ঘুরে বেড়াও, প্রাণের ভয় নেই? ধরো, এই কল্‌কাতা শহর!

ওঃ এই কথা।—রমাপতি কৌটা হইতে পুনরায় স্মৃতি বাহির করিয়া খাইল, তারপর বলিল, মোটরে ঘুরি, হাঁটিনে। যখন বিদেশে যাই তখন পকেটে রিভল্‌ভার থাকে।

কে কে আছেন তোমার?

উত্তর শুনিবার জন্য শিলি মুখ তুলিল। রমাপতি বলিল, বিশেষ কেউ না, মাত্র আমরা দুই ভাই, আমি ছোট। মা বাবা নেই।—ভালো বিপদ দেখি আপনাদের নিয়ে, মাল কিনবেন না, কেবল কুলুজি ঘাট্‌বেন, এ কি?

শিলি কহিল, আমার পছন্দ হচ্ছে না বাবা।

রমাপতি কহিল, অবাক করলেন। পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, অন্য জিনিষ আনব। যতক্ষণ না পছন্দ হয়,—ঠিক কোন্ জিনিসটি চান্ বলুন, তবে আমি ঠিক আন্‌তে পারব।

বঙ্কিম কহিলেন, নীলা আর হীরে, তার সঙ্গে এনো ভালো ব্রেসলেট্। মুক্তোর মালা আরো বড় চাই। টায়রা আন্‌বে হীরে বসানো। তোমার জিনিস সব খাঁটি ত?

রমাপতি তাহার জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিল, আপনার নিজের জহুরীকে আনবেন মশাই, তিনিই সব দেখে নেবেন। ইচ্ছে করলে ঠকাতে পারি, তবে কি জানেন, ঠকাতে ভালো লাগে না।

হাসিয়া বঙ্কিম কহিলেন, কেন?

টাকায় আমাদের অরুচি। যাক্ উঠি,—তাহ'লে আবার কাল আসতে হবে, কেমন?

আমার মেয়ের পছন্দ মতন জিনিস এনো।

পছন্দ না হ'লে ছাড়বোই না।—বলিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট ভরিয়া সে জিনিস লইয়াছে।

বঙ্কিমবাবু চলিয়া যাইবার পর শিলি কহিল, আঙুলের আংটিটার দাম কত?

এই আংটিটা?—বলিয়া রমাপতি তাহার সুন্দর বলিষ্ঠ হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কহিল এর দাম অমূল্য।

কেউ বুঝি উপহার দিয়েছে।

আরে, রামো। এ আংটির পাথর দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমার এক সাহেব বন্ধুর কাছে কিনেছি।

কত দিয়ে?

প্রায় ছ' হাজার টাকা। আচ্ছা, একটা কথা বল্‌ব?

শিলির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। কি কথা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে কেবল মুখ তুলিয়া চাহিল।

রমাপতি হাসিমুখে কহিল চমৎকার তুমি! তোমাকে দেখলে মানুষের প্রাণের মূল পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। এত রূপ!

শিলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। এই তরুণ জহুরীর কাছে তাহার নিজের চেহারা যে কিছুই নয়! সহস্র সুন্দরীর লাবণ্য দিয়া আঁকা এই রূপকুমারের মুখশ্রী,—ইহার কাছাকাছি দাঁড়াইলে

নিজের গায়ে যেন আলো পড়ে। কিন্তু পথের লোক হইয়া তাহার রূপের প্রশংসা হঠাৎ করিয়া বসিল্ কেন? গোপনে কি ইহার কিছু মতলব আছে?

কি যেন বলিতে গিয়া শিলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া একবার চারিদিকে চাহিল, তারপর হঠাৎ ছুটিয়া ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

লেখাপড়া জানা মেয়ের মুখের উপর পথের একটা লোক এমন করিয়া বলিয়া গেল, অথচ তাহাকে তিরস্কার করিতে মন উঠিল না। এমন ঘটনা শিলির জীবনে ঘটে নাই। সে স্কুলে গিয়াছে, কলেজে যাতায়াত করিয়াছে, অনেক সময়ে অনেক ছেলে পথে ঘাটে তাহার অনুসরণ করিয়া নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া শিলির মনে কেহ দাগ ধরাইতে পারিয়াছে, এমন কথা স্মরণ হয় না। বাহিরের জীবনটা তাহার সংযত, কোনো কিছুতেই সে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, কোথাও তাহার লোভের চেহারা দেখা যায় নাই। অজিকার ঘটনাটা তাহাকে যেন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল।

সে সুন্দরী একথাটা পুরাতন, তাহার রূপ আছে ইহা আরো প্রচলিত। নিজের রূপ লইয়া সে কোথাও গর্ব করে নাই, নিজেকে লইয়া সে কোনোদিন ভাবিতে বসিয়াছে এমনও তাহার মনে পড়ে না। কিন্তু আজ নিজেকে সে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। মেয়েদের গুণ, বিদ্যা ও বুদ্ধির আদর যতটুকু আছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি করিয়া আছে তাহাদের রূপের আদর। রূপই বোধ করি মেয়েদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়; পুরুষের পৃথিবী নারীর রূপের পায়ের তলায় আজিও লুটাইতেছে।

নিজের ঘরে আসিয়া শিলি আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া নানা রকম আজগুবী কথা ভাবিতে লাগিল। আজ যেন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়নে তাহার সমস্তই ওলোটপালট হইয়া গিয়াছে। ধাঁধাঁ

লাগিয়াছে চোখে, আর কিছুই দেখা যায় না। যাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইবার সম্পূর্ণ সুযোগ তাহার ছিল, সেই ছেলেটাই যেন যাইবার সময় তাহার কান মলিয়া দিয়া গেছে। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কেমন একটা অদ্ভুত পরাজয় যেন তাহার ঘটিয়াছে, মুখে চোখে সেই পরাজয়ের গ্লানি মাখিয়া তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

একটা কথা তাহার কানে কেবল বাজিতেছিল, চমৎকার তুমি! এত রূপ!

বাল্যকাল হইতে একথা তাহাকে অনেকে বলিয়াছে; তাহার রূপ, তাহার হাসি, তাহার দেহের গঠন,—কে না তাহার সুখ্যাতি করিয়াছে? কিন্তু কে জানিত, এই কথা দুইটির এত মূল্য! আজ যে ব্যক্তি তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া গেল, সে ত' একজন পথের ফেরিওয়ালা, অজ্ঞাতকুলশীল একজন যুবক,—অসভ্য, অশিক্ষিত, অর্বাচীন! পাণ খাইয়া সে জামাকাপড় নোংরা করে, বেহিসাবীর মতো কথা বলিয়া যায়, যুদ্ধের ঘোড়ার মতো বেপরোয়া চাল-চলনে ভদ্র মানুষকে সে বিরক্ত করিতে সাহস করে। তবু কেন যে থাকিয়া থাকিয়া শিলির মন মধুতে ভরিয়া উঠিতেছে কে জানে! তুমি চমৎকার, তোমাকে দেখিলে প্রাণের মূল পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে।

সম্মুখে তাহার বিবাহ, আর কয়েকদিন পরেই পাকা দেখা, আচার-আয়োজন চলিতেছে, পাত্রটি সকলের প্রিয় ও পছন্দসই,—ইহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহার এ কি বিসদৃশ মনোবিকলন? তাহার মনের কথাটা জানিলে লোকে বলিবে কি? ইহাই ত অন্যায়, ইহারই নাম ত দুর্নীতি! হউক সে শিক্ষিত বি-এ পাশ করা মেয়ে, যতই স্বাধীনতার ভিতরে সে মানুষ হইয়া উঠুক না কেন, এই অসংযত মনোবিকারের রাশ সে টানিয়া ধরিবে, ইহাকে প্রশ্রয় দিয়া সে তাহার অকলঙ্ক কৌমার্যকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিবে না।

পরদিন রমাপতি আবার আসিল। আশ্চর্য, তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে শিলি উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। অনেক রকম করিয়া নিজেকে সে তৈরী করিয়া রাখিয়াছিল, প্রয়োজন হইলে সামান্ত কারণেই রমাপতিকে সকলের সম্মুখে অপমানজনক কথা বলিয়া দিবে,—কিন্তু তাহাকে আসিতে দেখিয়াই শিলি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল, এবং নিজের হাতেই চেয়ারখানা টানিয়া দিয়া কহিল, বস্থন, আজ ভালো জিনিস এনেছেন ত ?

রমাপতি কহিল, ভালো জিনিস ছাড়া আমি কারবার করিনে। তোমরা যদি চিনতে না পারো আমি কি করব ?

সত্যি বলছ ?—শিলি তাহাকে 'তুমি' বলিয়া ফেলিল। বয়সের পার্থক্য সামান্ত, মাথায় তুইজনেই প্রায় সমান। 'তুমি' বলিলে অন্তায় হয় না।

রমাপতি হাসিল, গলা নামাইয়া কহিল, তোমার কাছে মিথ্যে বলবো না। আমার যা কিছু দেখছো সব ভালো।

শিলি এবার রাগ করিল, কহিল, চুপি চুপি কথা বল্‌ছ কেন ?

কারণ, আমার কথা কেবল তোমারই জন্তে। আঃ কী সুন্দর তোমার চোখের রং। কী চোখের পাতা ! যেন কালো ভ্রমর বসেছে নীলপদ্মের উপর।—রমাপতি মুগ্ধ চক্ষে চাহিল।

চুপ করো তুমি।

রমাপতি হাসিয়া উঠিল। কহিল, আরো, আরো কঠিন করো মুখ, আরো রাঙা হোক, চোখে আস্থক বিদ্যুৎবহ্নি, তরঙ্গে তরঙ্গে নাচুক আমার বুকের রক্ত।

শিলি উত্তেজিত হইয়া বলিল, থামো, তোমার পাগলামি শুন্‌তে চাইনে। জিনিস বার করো দেখি।

করব না। বলিয়া রমাপতি মাথা তুলাইল। তাহার রুক্ষ রেশমী চুলের গোছা তুলিয়া উঠিল। সুন্দর চুল, সুন্দর ললাট।

বিস্মিত হইয়া শিলি চোখ কপালে তুলিল। বলিল সে কি, কী জন্যে এসেছ?

রমাপতি কহিল, যা দেখাবো তাই তোমার পক্ষে হবে বেমানান।

কেন?

তুমি যে সুন্দর, তুমি যে আশ্চর্য! কোন্ অলঙ্কার তোমাকে মানাবে, কোন্ মুক্তোয় তোমাকে করবে অপরূপ?

শিলি তাহার দিকে চাহিল। দেখিল, লাবণ্যরসে টলোমলো তাহার মুখ, দুটি পাতলা ঠোঁট মসৃণ, চিক্কণ; আয়ত দুই চোখে সুন্দরের দেবতার সোনার স্বপ্ন, চাঁপার কলির মতো আঙুল,—বাস্তবিকই অপরূপ।

সে কহিল, আজ তোমার হাতে আবার নতুন আংটি? কালকের চেয়ে এটা আরো ভালো।

তোমার ভালো লাগছে?

শিলি হাসিল। রমাপতি আংটিটা খুলিয়া তাহার কাছে ফেলিয়া দিল। মেঝের উপর সেটা গড়াইতে লাগিল?

ব্যস্ত হইয়া শিলি কহিল, করলে কি? তোমার কি কোনো জিনিসে যত্ন নেই?

না।

মায়াও নেই?

একটুও না।

শিলি কৌতুক করিয়া কহিল, যে কোনো ভালো জিনিসকে তুমি অম্নি ক'রে ছুড়ে ফেল্তে পারো?

রমাপতি হাসিয়া বলিল, কিছুতেই আমার মন নেই, খেয়ালের খেলা সব। তুলে নাও আংটিটা, শিলি?

না, তুল্বো না। ওটা তুমি ফেলে দিয়েছ, আমাকে দাওনি। ভিখিরীর মতন আমি তুলে নেবো না।

রমাপতি কহিল, তবে হুকুম দাও, তুলে নিয়ে তোমার হাতে পরিয়ে দিই?

আস্পর্ধা!

তবে হুকুম দাও, আমার অঞ্জলি তোমার পায়ের কাছে রাখি?

কিছুতেই না। শিলি মাথা দুলাইয়া বলিল।

রমাপতি হাসিয়া বলিল, দানও নেবে না পূজাও গ্রহণ করবেনা?

না, দুটোই তোমার খেয়াল। দুটোই ভয়ঙ্কর।

তবে বলো কী দিয়ে তোমাকে আনন্দ দিতে পারি।

পায়ের শব্দ পাইয়া শিলির মুখের কথা থামিয়া গেল। রমাপতি তৎক্ষণাৎ তাহার পকেটের ভিতর হইতে নূতন জিনিসপত্র বাহির করিল।

ছোট পিসি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। কহিল, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি তোকে, এই যে, কী এনেছ আজ? দাদাকে ডাকব?

রমাপতি কহিল, ডাকুন, আজকে আপনাদের পছন্দ না হ'লে বুঝবো আপনারা পছন্দ করতেই জানেন না।

ইহার মাত্রাজ্ঞানহীন উক্তির কথা ছোট পিসি ভুলিতে পারে নাই, আজ সে সজাগ ছিল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, তোমার মুখ দেখে ত' আর আমাদের জিনিস পছন্দ হবে না, আমরা সব দেখে শুনে নেবো। ভারি পাকা পাকা কথা, কত বয়স তোমার?

রমাপতি কহিল, তেইশ।

বিয়ে করেছ?

মণিমুক্তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

ছোট পিসির শাসন ভাসিয়া গেল। সে হাসিয়া উঠিল। কহিল, কেন, দেশে মেয়ে নেই?

রমাপতি কহিল, না।

কেমন ক'রেই বা থাকবে! অত পাণ খাও, লক্ষ্মীছাড়ার মতন চেহারা, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

আংটিটা মেঝের উপর পড়িয়া এমনই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল, যে, শিলি একটু একটু পিছনে হাঁটিয়া সেটা পা দিয়া চাপিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কী যে বলিবে তাহা সে বুঝিতে পারিল না, তাহার মাথার মধ্যে গোলমাল বাধিয়া গেছে। রমাপতি অলক্ষ্যে সেইদিকে তাকাইয়া কৌতুক বোধ করিতেছিল।

ছোট পিসি কহিল, কথার উত্তর দাও না যে?

আঃ—রমাপতি হঠাৎ বিরক্ত হইল। হাসিয়া কহিল, তুমি দেবে তোমার মেয়ে, তুমি আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ!

ছোট পিসি আজ আর লজ্জিত হইল না। বলিল, আমি মেয়ে কোথা পাবো, বিধবা মানুষ। থাকলেও তোমার মতন উড়নচুড়ে ছেলের হাতে দিতুম না।

না দিতে না। গন্ধর্বকে ভয় ক'রো, তারা চুপি চুপি রাতের বেলা উড়িয়ে নিয়ে যায়। যাও, যাও, আনো ডেকে কর্তা মশাইকে। বড় জ্বালাতন করো তোমরা।

আগে আমাদের দেখাও কী এনেছ। আয় শিলি, দেখবি আয় ত?

রমাপতি কহিল, না, দেখাবো না তোমাদের। তোমরা মেয়েছেলে, আসল-নকল চিন্‌তে তোমরা কোনো জন্মেই পারো না।

ছোট পিসি তীব্রকণ্ঠে কহিল, খুব পারি। এই তুমি, তোমার মতন পাজি ছেলে কল্‌কাতায় নেই! পারিনি চিন্‌তে?

বা রে,—রমাপতি হাসিয়া বলিল, মুখে করছ নিন্দে, মনে করছ সুখ্যাতি। তোমাকে চিনি গো চিনি, মেয়ে থাকলে তুমিই আগে আমাকে জামাই করতে। ওই যা, আজ পাণের কৌটো আন্‌তে ভুলে গেছি! কী হবে?

পাণ দেবো না তোমাকে।

ওই ত্যাখো, না চাইতেই পাণ দিতে চাও। রমাপতি হাসিমুখে কহিল, পাণ দেবার জন্তে মন তোমার উৎসুক। না দিতে পারলে আজ রাতে তোমার ঘুম হবে না।

শিলি চেঁচাইয়া উঠিল। বলিল, মুখ সাম্‌লে তুমি কথা ব'লো। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে—

রমাপতি নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, ওই নাও! দেবতারাও জানেন না তোমাদের! ত্ু' জনের মধ্যে গভীর বিদ্বেষ! একজনকে একটু প্রশ্রয় দিলে আর একজন রাগ করে।

শিলি কহিল, তুমি অত্যন্ত ইতর।

ওই নাও, মনে মনে আবার আমাকে ভদ্র ক'রে তোলবার চেষ্টা।—রমাপতি হাসিয়া বলিল, আর পারিনে তোমাদের নিয়ে। এ বলে আমায় ত্যাখ্, ও বলে আমায় ত্যাখ্।

ছোট পিসি উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, দাদাকে ডেকে আনি, তোমার পেজোমি বা'র করছি।

রমাপতি কহিল, অম্‌নি পাণ এনো শাশুড়ী ঠাকরুণ, যদি না আনো তবে পরের জন্মেও বিধবা হবে।

ছোট পিসি চলিয়া গেল।

আংটিটা তুলিয়া টেব্‌লের উপর রাখিয়া শিলি কহিল, জিনিস বেচতে এসেছ, ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে কথা বল্‌তে শেখোনি?

না।

তোমার আংটিতে আমি লাথি মারি।

আচ্ছা, এবার তোমাকেই পাণ আন্‌তে অনুরোধ করব, তা হ'লে হবে ত? যেন সতীনের আড়ি!

ছাই তুলে দেবো তোমার মুখে। বদ্‌মায়েসি করবার আর বুঝি জায়গা পাওনি ?

না। কিন্তু কী সুন্দর তোমার রাগ !

শিলি কহিল, কত মেয়ের কাছে এমন কথা বলেছ ?

কী সুন্দর তোমার বিদ্রূপ !

লজ্জা করে না মেয়েমানুষের আঁস্তাকুড়ে ঘুরতে ?

রমাপতি তাহার দিকে চাহিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিল। চক্ষু যেন তাহার শিবনেত্র, আয়ত, দীর্ঘ ! অপূর্ব তাহার সংযুক্ত ভ্রূরেখার ভঙ্গী। বলবান বক্ষঃস্থল, পেশীবহুল বলিষ্ঠ দুই হাত,—এমন শ্রী দেবতাতে দুর্লভ !

শিলি তাহার দিকে চোখ রাখিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া কম্পিতকণ্ঠে পুনরায় কহিল, অসচ্চরিত্র !

রমাপতি কহিল, এ কি করেছ তুমি ? আংটিটা যে বেঁকে গেল তোমার পায়ের চাপে ?

শিলি একটু অপ্রস্তুত হইল। কহিল, তুমি আমাকে দিয়েছিলে কেন ?

রমাপতি কৃত্রিম অভিনয় করিয়া কহিল, আমি ত' দেখাবার জন্যে দিয়েছিলুম তোমার হাতে ? তাই ব'লে তুমি নষ্ট করবে ? কত দাম জানো ? আড়াই হাজার ! আমি কিছু শুনতে চাইনে, তোমার বাবাকে বল্‌ব।

শিলি ভয় পাইয়া বলিল, কী বল্‌বে তুমি ?

বল্‌ব আপনার মেয়ে আমার এই লোকসান করেছে, আপনি যদি ক্ষতিপূরণ না দেন্ তবে এখুনি পুলিশ ডাক্‌বো।

শিলি ঢোক গিলিল। বলিল, আমার কী অপরাধ ?

রমাপতি কহিল, সে কথা পুলিশ বিচার করবে। জানো আমার মামা কলকাতার এই ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার ?

ভয়ে শিলির পা কাঁপিতে লাগিল, তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল। এই ভয়ঙ্কর, সর্বনাশা ছেলে তাহাকে যে এমন বিপদে ফেলিবে একথা কে জানিত? বাবার কাছে যে একে একে তাহার সব লজ্জা প্রকাশ হইয়া পড়িবে! লোকে কী বলিবে? এ কলঙ্ক কেমন করিয়া ঢাকিবে?

রমাপতি কহিল, জানো আমি ব্যবসাদার, একটি পয়সাও ছাড়তে পারব না? তা ছাড়া আজকের আর কালকের সব ইতিহাস আমি ব'লে দেবো। তোমার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। পাত্রপক্ষের কাছে তোমার কলঙ্কের সব কথা জানাবো। লোকে তোমাদের ছি ছি করবে, অসচ্চরিত্র বল্‌বে।

শিলি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া আসিল। তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার স্বাধীন মন সমস্তই যেন ভাসিয়া গেল। এই নির্বোধ অশিক্ষিত ও ছোক্‌রা ব্যবসাদার যেন তাহার সকল সম্ভ্রম নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছে। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সে মিনতি করিয়া কহিল, আমায় ক্ষমা করো তুমি, বাবার কাছে কিছু ব'লো না।

ক্ষমা! আড়াই হাজার টাকা দামের আংটি! ক্ষমা এতই সস্তা! চোখের জলে যদিও তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে, কিন্তু সে আমি পারব না। অলঙ্কার বিক্রি ক'রে আমাদের পেট চলে, তোমার সুন্দর মুখ আর চোখের জলে ত' আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না, শিলি। এই নাও, রেখে দাও আংটি, কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে। কাল পর্যন্ত সময় রইল, আড়াইটি হাজার টাকা আমাদের দোকানে কাল জমা দিয়ে এসো। নৈলে পুলিশে গিয়ে আমরা—

বাহিরে চটি জুতার শব্দ হইল।

রমাপতি কহিল, অবশ্য তোমার বাবাকে সব কথাই ব'লে যাচ্ছি—

শিলি হঠাৎ দুই হাত জোড় করিয়া আকুল কণ্ঠে কহিল, তোমার-পায়ে পড়ি রমাপতি—

সাবধান আমাকে ছুঁ'য়ে আরো কলঙ্ক হবে। তুলে নাও আংটি বল্‌ছি, নৈলে ভালো হবে না। পায়ে ধ'রে এখন কান্নাকাটি করতে এসেছ, কেমন ? বেরিয়ে যাও ঘর থেকে, চোখের জল মুছে এসো।

অনুগত দাসীর মতো শিলি আংটিটা লইয়া অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই যে আসুন, সেই কখন্ থেকে ব'সে আছি, কারো দ্যাখা নেই।

বঙ্কিমবাবু আসিয়া বসিলেন। ছোট পিসি পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে চোখে হাসি ও কৌতুক। বুঝা গেল, সব কথা সে চাপিয়া গেছে। রমাপতি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার জিনিসপত্র বাহির করিল।

ওই যে, পান এনেছেন হাতে, দিন্, দিন্। বলিয়া সে একসময়ে হাত বাড়াইল।

ছোট পিসি পান আনিয়াছিল কিন্তু চাহিবার আগেই হাত তুলিয়া দিবার সাহস তাহার হইতেছিল না; হয়ত দাদা কিছু মনে করিতে পারেন। এইবার সে পান দিল, রমাপতি চোখ বুজিয়া দুই তিনটা পান মুখে পুরিয়া লইল।

নতুন মুক্তার মালা, বিচিত্র টায়রা, হীরা-বসানো ব্রেসলেট, নীলার আংটি, প্রবালের দুল, বঙ্কিমবাবু সমস্তগুলি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে বলিলেন, শিলি কই ?

শিলি দরজার পাশেই ছিল, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কিম হাসিয়া বলিলেন, সবগুলোই নিতে হয়, না মা ? এগুলো পছন্দ হয় ত ?

শিলি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহার পছন্দ !

রমাপতি হাসিল। বলিল, হতেই হবে, যে সে জিনিষ নয়, পছন্দ না হ'য়ে যাবে কোথায় ?

খাঁটি ত ?

দেখে নিন্ ভালো ক'রে। নকল জিনিসের ফিরি করিনে, মশাই। মেয়েদের দেখিয়ে আনুন, যদি ফাঁকি থাকে তাদের চোখে ঠিক ধরা প'ড়ে যাবে।—রমাপতি তাহার আগেকার মতের উল্‌টা মতটা হঠাৎ ব্যক্ত করিয়া শিলিকে বিস্মিত করিল।

বঙ্কিম কহিলেন, মালাটার দাম কত ?

সাত শো।

আর এই আংটিটার ?

দেখুন, আংটির সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বল্‌তে চাই।

ভয়ে শিলির বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিল, তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিল। বিবর্ণ মুখে সে চাহিল।

রমাপতি কহিল, একটু আড়ালে আপনাকে বল্‌ব।

শিলি উত্তেজিত হইয়া বলিল, না, সামনেই বলো। আমি থাকবো এখানে।

বঙ্কিম একটু অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, ও যদি একটু আড়ালেই বল্‌তে চায় মা ?

না বাবা, সামনেই বলুক। কী দোষ করেছি আমরা ?

রমাপতি কহিল, যান না আড়ালে, বাবার অবাধ্য হচ্ছেন কেন ?

পিতার মুখের দিকে নিরুপায় ও বিবর্ণ মুখে চাহিয়া শিলি ছোট পিসির সহিত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি কি-যে বলিবে আর কি-যে না বলিবে তাহাই ভাবিয়া পুনরায় তার কান্না পাইতে লাগিল।

পিছনের দরজার দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া রমাপতি কহিল, এই নীলার আংটিটা আপনি নিন্, কিছু সস্তায় দিতে পারবো।

বঙ্কিম বলিলেন, সস্তায় দিতে চাও কেন ?

আপনি এর দাম কত মনে করেন ? এর আসল দাম আটশো টাকা। আপনাকে তিনশোয় ছেড়ে দিতে পারি।

কেন ? এ যে বড় সন্দেহজনক !

রমাপতি কহিল, দেখুন সত্যিই বল্‌ছি, নীলা আমাদের দোকান থেকে বিক্রি হ'তে চায় না। ওটা যেন কেমন অপয়া। একজন এটা অর্ডার দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি নিতে পারেননি। আপনি যেন দয়া ক'রে কাউকে বলবেন না' যে, এত সস্তায় আপনি পেয়েছেন।

তোমার কথায় অবশ্য বিশ্বাস করাই উচিৎ, কিন্তু ধরো যদি—

তবে আপনি যাচিয়ে নিন্ জহুরী এনে। কেন বল্‌ব মিথ্যে ?

টাকায় আমাদের লোভ কম, আমাদের কোম্পানী অনেক বড়। রতিপতি রায় কোম্পানীর দোকান ঝাঁট্ দিলে অমন দশ বিশটে আংটি জঞ্জাল থেকে বেরোয়।—রমাপতি কহিল, ভারি ঝামেলা দেখছি। মাত্র হাজার তিনেক টাকার মাল বেচ্‌তে এসে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলাম। নেবেন ত নিন্।

বঙ্কিম কহিলেন, ব্রেসলেট কি হাজার টাকার কমে দেবেনা ?

কানা কড়িও না।

তাহ'লে ব্রেস্‌লেট্, আংটি, মালা আর টায়রা—কেমন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' হাজার দুশো পঁচিশ টাকা বে'র ক'রে দিন্।—আহা, পানের মধ্যে কী ?

বঙ্কিম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কেন, কিছু চিবিয়েছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বালি ! বালি আর কাঁকর আগাগোড়া। আমাকে জব্দ ক'রে দিয়েছে !

তিনি হাঁক দিয়া ডাকিলেন। শিলি ও ছোটপিসি আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, পানে এত বালি কাঁকর কেন ?

ছোট পিসি কহিল, বালি ? সে কি ?

যাও, মুখ ধোবার জল পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করো তুমি, শিলির ঠাকুরমাকে এগুলো দেখিয়ে আনি। বলিয়া বঙ্কিমবাবু উঠিয়া গেলেন। শিলি তাঁহার সঙ্গে গেল। এখানে আর একা থাকিতে তাহার সাহস নাই। আংটিটা সে হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া ছিল। কিন্তু যাইতে যাইতে সে ভাবিল, পানের মধ্যে অত কাঁকর আসিল কোথা হইতে ? ছোট পিসি যেন কী হইয়াছে আজকাল !

ছোট পিসি জল লইয়া আসিল। হাসিয়া কহিল, কেমন জব্দ ? ওই তোমার শাস্তি !

রমাপতি কহিল, কোন্ শালী পান সেজেছে বলো ত ?

পান ছোট পিসির নিজের হাতেই সাজা। তাহার মুখের চেহারা হঠাৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিল, ছি ছি ভদ্র-ভাষা শেখোনি ? ঝিয়ের হাতে সাজা পান তোমাকে দেবো কেন, আমি নিজেই ত সেজে এনেছি !

তাই নাকি ?—রমাপতি হাসিয়া কহিল, শাশুড়ীকে শালী ব'লে গাল দিলুম ?

নাক খৎ দাও।

না, পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইবো।

ছুঁতে দেবো তোমাকে ? কিল বসিয়ে দেবো পিঠে। কই, মুখ ধুলে না যে ?

রমাপতি জলের গেলাস লইয়া মুখে ধরিল, এবং সমস্ত জলটাই এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল।

ছোট পিসি কহিল, ওর নাম মুখ ধোয়া ? বালি-কাঁকর পেটে গেল যে ? ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

রমাপতি কহিল, জামাই আদর করেছ, যা দিলে সব খেয়েই ফেললুম।

দাদা কি বুঝতে পেরেছেন ?

বুঝিয়ে দিলেই পারতুম। তোমাদের মনের চেহারাটা জানতে পারতেন।—বলিয়া রমাপতি হাসিল।

ছোট পিসি ভয় পাইয়া কহিল, বলো না যেন লক্ষ্মীটি।

ঠিক সময়েই বল্‌ব। তুমি জব্দ হবে। বাইরের একটা ছেলে ভেতরে এলে তোমরা বুঝি এমনি হাসি-তামাসা করো ? এই বুঝি তোমাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি ?

ছোট পিসি তাহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে কহিল, এমন কাজ আর করব না, তুমি ক্ষমা করো। আমি বিধবা মানুষ, লোকে বল্‌বে কি ?—তাহার ব্যাকুল চোখে সহসা অশ্রু আসিতে চাহিল।

ঘরে কেহ নাই। রমাপতি চতুর্দিকে তাকাইয়া কহিল, আগে বলো আমি যা বল্‌ব তাই শুন্‌বে ?

ছোট পিসি এদিকে ওদিকে তাকাইয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, শুন্‌বো।

একটুও আপত্তি করবে না ?

না।

কাউকে বল্‌বে না ?

না।

রমাপতি কহিল, বেশ, তবে কাছে এসো।

ছোট পিসি সরিয়া আসিল। রমাপতি একগাছা মুক্তোর মালা লইয়া সযত্নে তাহার গলায় পরাইয়া দিল। তারপর পরম স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে নিতান্ত নিকট আত্মীয়ের মতো কহিল, কোনো দোষ তুমি করোনি। দোষ তাদের যারা তোমাকে বিধবার সজ্জায় সাজিয়ে রেখেছে! তোমার স্বভাব ধর্মকে যারা মেরেছে!

ছোট পিসির হৃদয় যেন হঠাৎ চুরমার হইয়া পড়িল। করুণকণ্ঠে কহিল, এমন সুন্দর তুমি তা জানতুম না।

রমাপতি তাহার দুইটি হাত ধরিয়া কহিল, কোনো লোভ নেই তোমার ওপর, আমি মালাটা দিলুম তোমার প্রতি সম্মানের চিহ্ন। ওইটি তোমার গোপন সান্ত্বনার সম্পদ্, আমাকে মাঝে মাঝে স্মরণ ক'রো।

ছোট পিসি বলিল, আমার স্বামীর ছবি আছে আমার ঘরে, রমাপতি।

বেশ ত, সেই ছবির ফ্রেমে ঝুলিয়ে দিও ওই মালা। মনে ক'রো বন্ধুর দান!

পায়ের শব্দ পাইয়া পাশের দরজা দিয়া ছোটপিসি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার চোখে অশ্রু জমিতেছিল।

বঙ্কিমবাবু আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে শিলি আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ, হয়েছে। এগুলো তবে রেখে যাও! টাকা কী ভাবে দেবো, নগদ টাকা ত হাতে নেই?

রমাপতি স্পষ্ট করিয়া কহিল, কিন্তু ধারে কারবার আমরা ত' করিনে।

শিলি কহিল, আমরাও করিনে। আপনি ওকে চেক্ লিখে দিন্ বাবা। আমি চেক্ বই আনি!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আমার পকেটেই আছে মা।

রমাপতি বলিল, লিখুন, একুশ শো পঁচিশ টাকা।

বঙ্কিমবাবু চেক্ লিখিয়া দিলেন। বলিলেন, আবার দরকার হ'লে ডাকবো, মনে রেখো, বাবা?

রমাপতি কহিল, স্নেহ রাখবেন আমার প্রতি। মাঝে মাঝে আমার জলতেষ্টা পায়, চাইকি আপনার এখানে এক আধবার উঁকি মারতে পারি।—বলিয়া সে অলক্ষ্যে একবার শিলির দিকে চাহিয়া লইল।

বেশ ছেলে তুমি—বলিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শিলি গম্ভীরমুখে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হইল।

তিনি দরজা হইতে বাহির হইবার পর শিলি দ্রুতপদে আসিয়া কহিল, কী বলেছ তুমি বাবাকে?

ধীরে সুস্থে গুছাইয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনেক কাজ বাকি আছে; বাজে কথা বলিবার সময় নাই। শিলি তাহার ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অধীর কণ্ঠে কহিল, বলো কী বলেছ তুমি বাবাকে?

রমাপতি কহিল, বললুম যা বলবার। কিছু ত আর বাকি রাখোনি,—সবই প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, এই দুর্নীতির প্রতিবিধান করবেন।

এই নাও তোমার আংটি—

ওটা তোমার বাবার কাছে রাখতে দিয়ো। তিনি তোমার গুণের কথা জেনেছেন।—বলিয়া রমাপতি অগ্রসর হইল।

শিলি কহিল, পুলিশে গিয়ে তুমি সব বল্‌বে?

নিশ্চয়ই, আমি এখুনি ডায়েরী করব।

তুমি চোর, তুমি লম্পট, তুমি—

তাহার বিদীর্ণ কণ্ঠ শুনিয়া রমাপতি হাসিল। কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া সহসা সংযত ভাবে শিলি কাছে সরিয়া আসিল। আপন উত্তেজনাকে সংযত করিয়া সে রমাপতির একটা হাত ধরিল! অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিল, আমাকে বিপদে ফেলো না তুমি।

রমাপতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। দুইটি সুন্দর চোখ—দুইটি অপরূপ চোখের ভিতর তাকাইয়া কী যেন খুঁজিতে লাগিল। রমাপতির মসৃন উজ্জ্বল মুখখানা লাবণ্য-রসে টসটস করিতেছে, কোথাও খুঁৎ নাই, কোথাও প্রণয় অভিজ্ঞতার লেশমাত্র দাগ পড়ে নাই। যেমন সুন্দর তেমন তরুণ তেমন মধুর। শিলির হাওয়ায় কেমন একটি মিষ্ট গন্ধ, শুচিসুন্দর কৌমার্যের অপরূপ কমনীয়তা, অপূর্ব লালিত্য।

দেখিলেই মনে হয়, পুরুষ তাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই। তাহার দেহ ও পরিচ্ছদে কেমন যেন অদ্ভুত মাদক-মদির সৌরভ, একটা স্বপ্নাবেশের নেশা। তাহার ভয়ের সঙ্গে জড়ানো প্রণয়ের আভাস,— তাহার দম্ভের সঙ্গে নিরুপায় আত্মসমর্পণ যেন একটি বিচিত্র শ্রী মিলাইয়া দিয়াছে। রমাপতি তাহার সর্বশরীরের উপর চোখ বুলাইয়া যখন নিবিড় তৃপ্তিতে দেখিতে লাগিল, শিলি তখন নিজেকে সম্বরণ করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে ভুলিয়া গেল। ফুল যেন ভ্রমরের দিকে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

মৃদুকণ্ঠে শিলি কহিল, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই শুন্‌বো।

ঠিক শুনবে ত? বাধা দেবে না?

না। তোমার যে কোন হুকুম মান্‌বো।—শিলির গা কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। সে রমাপতির দুইটা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া বলিল, তুমি এত ভয়ঙ্কর কেন? তুমি জহুরী, না শিল্পী, কে তুমি? নিজের রূপ দিয়ে কেন তুমি এমন আগুন জ্বালাও?

আমি বড় দরিদ্র, শিলি!

দরিদ্র হয়েও তুমি বড়, তুমি মহাদেব! তুমি একদিকে ভোলানাথ, অন্যদিকে প্রলয়ঙ্কর। আমাকে তুমি এমন ক'রে ধ্বংস ক'রো না!— শিলি পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

রমাপতি কি-যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তাহার মোটর অপেক্ষা করিতেছিল।

বাহিরে রাত্রি থম থম করিতেছে। বারোটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই। নিজের ঘরে ঢুকিয়া ছোটপিসি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সুইচ্‌ টিপিয়া আলো জ্বালিল।

কেমন একটা বিস্ময়কর অস্বস্তি। খানিকটা আনন্দের সঙ্গে বাকিটা যেন ধিক্কার। মাধুর্যের সঙ্গে মিশানো দুর্নীতি। ভয়ের সঙ্গে ব্যর্থতার বেদনা।

ছোটপিসি কাহাকেও জানিতে দিল না, নিজের আচরণকেও যেন সে নিজের বিবেকের নিকট লুকাইতে লাগিল। মাথা তুলিতে পারিল না, মাথাও হেঁট করিল না, অথচ যেন নিজের মুখের চেহারাটাও কিছু পরিমাণে অস্বস্তিকর বোধ হইতেছে।

ক্যাশবাক্সের ভিতর হইতে মুক্তার মালাটা সে বাহির করিল। হাত কাঁপিতেছে, বুক কাঁপিতেছে। যেন এই সুন্দর মুক্তার ভিতর দিয়া রমাপতি হাসিয়া বলিতেছে, তোমার প্রতি আমার লোভ নাই, কিন্তু বিধবা হইয়া এ তুমি কী করিতেছ? কেন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমার বয়স? কেন জানিতে চাহিয়াছিলে আমার বিবাহ হইয়াছে কি না? পানের মধ্যে বালি আর কাঁকর মিশাইয়া কেন করিয়াছিলে তামাসা? মনের কোন্ ক্ষুধা জমা আছে?

ছোটপিসি দিব্য দৃষ্টিতে নিজের চেহারাটা দেখিতে লাগিল। রমাপতির নিকট তাহার বারম্বার যাতায়াত, নানা অছিলায় কথোপকথনকে দীর্ঘ করিয়া তোলা, অকারণ কৌতূহল, রমাপতির দোষস্খালনের চেষ্টা, তাহার রূপের প্রশংসা, দাদাকে দিয়া তাহাকে শাসন করিতে ভুলিয়া যাওয়া,—সমস্ত মিলাইলে কী অর্থ দাঁড়ায়?

মুক্তার মালা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিজের হাতে পান সাজিয়াছিলে কেন? নাকখৎ দেওয়াইয়া কেন খুশি হইতে চাহিয়াছিলে? পায়ে হাত দিয়া ক্ষমা চাহিলে তুমি কি আনন্দিত হইয়া কিল বসাইতে না তাহার পিঠে? তুমি নিশ্চয় তরুণের স্পর্শ চাও, তোমার সংযম ও বিবেচনার পিছনে রহিয়াছে রূপবান পুরুষের প্রতি লোভ! তারপর পরিশেষে—কাছে গিয়া তাহার হাতে মালা পরিয়াছিলে না? রক্তে-

কি তোমার দোলা লাগে নাই? সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলে কেন? ওগো হিন্দুঘরের চরিত্রবতী বিধবা, কৃতজ্ঞ থাকো রমাপতির কাছে, সে তোমার চরিত্র ও সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে! সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তোমার মতো বহু বিধবা প্রণয়-প্রশ্রয়িণী হইয়া উঠিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই!

মুখ তুলিয়া ছোটপিসি দেখিল, দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটো। মাত্র ছয় মাসের জন্য পরিচয়, তাহার পরেই নিউমোনিয়ায় তরুণ যুবকটির অপ্রত্যাশিত অকাল-মৃত্যু ঘটে। নয় বৎসর ধরিয়া সেই ছয় মাসের স্মৃতি বহন করিতে হইতেছে, চিরজীবনই করিতে হইবে। স্বামীর স্মৃতি পবিত্র সন্দেহ নাই, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রহিয়াছে তেমনই অকৃত্রিম, কিন্তু আজ নারীর প্রকৃতি যদি বৈধব্যের বন্ধন ডিঙাইয়া জাগিয়া উঠিতে চায় তবে দোষ কাঁহার? কোন্ পথ দিয়া সংযমকে ধরিতে হয়, কোথা দিয়া আসে নীতিবোধ—তাহা সে জানে না। প্রণয় নিরোধ করিয়া থাকাটাই কি বিধবার ব্রহ্মচর্য?

ছবির তলায় মাথা রাখিয়া ছোটপিসি কাঁদিল। কাহাকে জানাইবে তাহার এই দ্বন্দ্ব? সুস্থ মন ও সবল দেহের স্বভাবের ভিতরে থাকে যে বাসনা আর আসক্তি, যে সতেজ প্রাণময়তা, যে প্রণয়-লোলুপতা ও সন্তানের ক্ষুধা,—তাহা কি কেবল লোকরুচির অনুশাসনেই মনের মধ্যে বিলীন হইতে চায়? নীতি ও দুর্নীতির অতীত কি কোনো সত্য নাই?

মুক্তার মালাটা যেন তাহার প্রচলিত জীবনযাত্রায় একটা নিদারুণ বিপ্লব বাধাইয়া দিল। ভালো, মন্দ, সত্য-মিথ্যা, বৈধব্য-ব্রহ্মচর্য সমস্তগুলাকে পদদলিত করিয়া চুরমার করিয়া সব যেন একাকার করিয়া দিল। কেমন একটা নিদ্রিত চেতনা তাহাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সংসারের সকল সংস্কার হইতে টানিয়া লইয়া এক মহাসমুদ্রের তীরে ছাড়িয়া দিল। কোনো পথ তাহার জানা নাই, কোন্ পথে সে যাইবে?

ফটোখানা খুলিয়া সে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, তারপর বিছানায় শুইয়া ছবিখানাকেই সে বুকের কাছে রাখিল। মুক্তার মালাটাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে পারিল না। ইহা বন্ধুর দান মূল্যবান সম্পদ্। বেড্-সুইচ্ টিপিয়া আলোটা সে নিবাইয়া দিল, তারপর অন্ধকারে সযত্নে মালাটা গলায় পরিয়া ফটোখানা দুই হাতের মধ্যে লইয়া সে চোখ বুজিল। তাহার ন্যায় ও অন্যায়ের জন্য তিনিই দায়ী, যিনি সকল মানুষের অন্তর্যামী!

লালবাজারের এক দোকানের ধারে আসিয়া শিলি ট্যাক্সি হইতে নামিল। সম্মুখে রতিপতি রায় এণ্ড কোম্পানী। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে দোকানে উঠিল। খরিদ্দার আসিয়াছে মনে করিয়া দোকানের জন-জটলার ভিতর হইতে একটি লোক আসিয়া বলিল, আসুন, ওই দিকে আমাদের শো-কেস আছে।

শিলি কহিল, থাক্, আমি চাই রমাপতিবাবুকে।

এই যে তিনি।

বলিতে বলিতেই রমাপতি আসিয়া দাঁড়াইল। কর্মচারীটি চলিয়া গেল। শিলি দেখিল রমাপতির নূতন পোষাক। সাহেবের মতো সাজসজ্জা, কোথাও খুঁৎ নাই। শিলি মুহূর্তে তাহার দিকে চোখ বুলাইয়া সাগ্রহে কহিল, নালিশ করেছ?

রমাপতি হাসিয়া কহিল, নালিশ! কা'র নামে?

হাতের মুঠার মধ্যে আংটিটা ছিল, শিলি তাহা দেখাইয়া কহিল, এর জন্যে?

ওঃ—এসো তুমি এদিকে, শো-কেসের দিকে যাই, এদিকে বড় ভিড়।

দোকানটা বড়। নানা ঐশ্বর্যের চাকচিক্যে চোখ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। সোনা, রূপা, প্লাটিনম্, হীরা, মণি, মুক্তা,—যেন রাজার ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে। অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন স্থানে

গিয়া রমাপতি কহিল, লাল শাড়ী কে পরালো তোমাকে, কোন্ শিল্পী? তুমি কি দেবী? অপ্সরী?

শিলি কহিল, নালিশ কি সত্যিই করবে?

সে এক সময় করলেই চল্বে, আগে তোমাকে দেখি! কপাল-ঝরা চুলের গোছা, চোখে যেন আমারই প্রাণের চেতনা, যে পথ দিয়ে এলে তুমি, সেখানে কি এখনো ফুল ফুটে ওঠেনি?

আংটিটা তবে ফিরিয়ে নাও?

রমাপতি হাসিয়া উঠিল। কহিল, দেবী সবই যে মিথ্যে!

কী মিথ্যে?

কে নালিস করবে কা'র বিরুদ্ধে? তুচ্ছ আংটি, তোমার পায়ের তলায় হৃদয়কে ঢেলে দিলেও যে আনন্দ! তোমার উদ্বেগের মধ্যে যে অসীম সৌন্দর্য দেখতে পেলুম, আমি কি সেই লোভ ছাড়তে পারি?

শিলির মুখে দেখিতে দেখিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, এবার তবে আংটি ফিরিয়ে নাও?—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল।

রমাপতি বলিল, তার বদলে তুমি কি চাও বলো?

শিলির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মাথা হেঁট করিয়া কহিল, যা চাইবো তাই ত তোমার কাছে সামান্য। এমন জিনিস নেই যা দিলে তুমি সর্বস্বান্ত হও?

রমাপতি অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর বলিল, কই, আমি ত কিছু ভেবে পাইনে!

শিলি কহিল, দেবার অহঙ্কার তোমার আছে, তাই ত' তোমার দানে মন খুশি হয় না!

সব মণিমুক্তো তোমায় দিয়ে দিতে পারি, শিলি।

সহজে দিতে পারো বলেই ত' ওগুলো এত সস্তা। যাই, এবার আমি উঠি। অনেক কাজ।

রমাপতি কহিল, না। দাঁড়াও। বসো এইখানে, অনেক কথা আছে।

আংটিটা নিয়ে যাও?—বলিয়া শিলি হাত বাড়াইল।

ফেলে দাও এই শো-কেসের মধ্যে।—বলিয়া রমাপতি জরুরী কাজে চলিয়া গেল। শিলি মুখ ফিরাইয়া দেখিল একজন কর্ম্মচারীর নিকট একটি মেয়ে প্রশ্ন করিতেছে, রমাপতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই নমস্কার বিনিময় করিল। তারপর দুইজনেই দূরে গেল, রমাপতি তাহাকে লইয়া নানা অলঙ্কার দেখাইতে লাগিল। সম্ভবতঃ নূতন খরিদ্দার!

আধঘণ্টারও বেশি দেরী হইল। সকল কাজ ফুরাইয়াছে, বসিয়া থাকিবার আর কোনো হেতুও নাই, তবুও শিলির পা উঠিল না, উন্মুখ হইয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল; তাহার চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। একটা ভয়ানক নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। 'অনেক কথা' তাহার না শুনিলেই চলিবে না। অথচ কোনো কথাই আর বাকি নাই ইহা সে জানে, যে বিপদে সে পড়িয়াছিল তাহা হইতেও সে মুক্তি পাইয়াছে,—ইহার পরে আবার কোন কথা? শিলি বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, ছেলেরা কি এইরূপ? এমনি বেপরোয়া, এমনি সুন্দর, এমনি অগোছালো? ছেলে সে অনেক দেখিয়াছে কিন্তু তাহারা আত্মীয়-স্বজন, অতি-ঘনিষ্ঠতার পরিচয়ের মধ্যে তাহারা বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষ আসে অনন্ত বৈচিত্র্য লইয়া, তাহাদের ভিতর দিয়া অনাবিষ্কৃত এক দুর্লভ জগতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রমাপতি কি তাহাদেরই একজন? ইহার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে কেমন অপরূপ সারল্য, ইহার কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তৃতার ভিতরে ইহারই দুরন্ত প্রাণের অপরিমেয় ঐশ্বর্য, ইহার বলবান স্বাস্থ্য, বাধাবন্ধনহীন মন, রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি নিবিড়

অনুরাগ, লোকরুচি ও সংস্কার হইতে উত্তীর্ণ ইহার সকল আচরণ,—এমন পুরুষ দুর্লভ।

শিলির মনে কেমন একটা ব্যথা জমিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল আর কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার বিবাহ। যাহাকে জানে না, চিনে না, যাহার কোনো চিন্তাধারার সহিত তাহার পরিচয় নাই, তাহারই হাতে সে আপন জীবনকে তুলিয়া দিবে। যে-পথ দিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে সে-পথ যেন দুর্গম অন্ধকারে ভয়ভীষণ, সমস্যা-সঙ্কুল, তাহার সহিত নিজেকে মিলাইতে হয়ত প্রাণান্তই হইবে। হউক বিলাত-ফেরৎ, হউক ভালো চাকুরে, হউক সে যতই সুজন ও শান্ত, কিন্তু সে কি এমনই সুন্দর, এমনই প্রাণচঞ্চল, তাহার হৃদয় কি এমনই দূরপ্রসারী, নারীকে খুশী করিবার কি তাহার এমনি মধুর আয়োজন?

ওগো কল্পময়ী!

শিলি মুখ ফিরাইল। তাহার চক্ষু-পল্লবের গোড়ায় অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখ তুলিয়া দেখিল, মাথায় টুপি দিয়া রমাপতি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে, দুইটা হাত সে ট্রাউজারের মধ্যে ঢুকাইয়া সাহেবী ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। প্রভাত-সূর্যের দিকে শতদল যেমন চোখ মেলিয়া তাকায়, তেমনি করিয়া শিলি কয়েক মুহূর্ত তাহার দিকে চাহিল। তারপর সে নিজেই রাগ করিয়া কহিল, ব'সে ব'সে তোমার হাসি দেখতে এলুম?

রমাপতি কহিল, চলো যাই?

কোন্ চুলোয়?

পতঙ্গের পাখা পুড়িয়ে দেবে না?

শিলি কহিল, পতঙ্গ তুমি নও, তুমি পাখী। আগুনের চেয়ে আলো তোমার প্রিয়, সেই আলোয় তোমার কলকূজন।

তবে নিয়ে চলো সেই আলোর পথ দিয়ে!

সমুদ্র পার হয়ে যেতে হবে, মনে রেখো।

রমাপতি কহিল, তাই যাবো; আমাদের পথের নীচে তরঙ্গে তরঙ্গে উঠুক প্রচণ্ড প্রতিবাদ, ঝড়ের মেঘে নামুক প্রলয়ের অন্ধকার, মহাশূন্যের পথ দিয়ে চলো আমরা উড়ে যাই গান গেয়ে অসীম আলোর দিকে। চলো দেবি, জীবন আর মরণকে উত্তীর্ণ হই।

শিলি কহিল, কবিত্ব রাখো। কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

যদি তোমাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাই?

শিলি হাসিয়া জবাব দিল, তোমাকে দেখে ভুলতে পারি, কিন্তু পথ ভুল করব না। বাঙালীর মেয়ে বাঁধা পথ ভোলে না।

রমাপতি কহিল, তুমি ত' বলেছ আমার স্বভাবের মধ্যে আছেন ভোলানাথ, আমি চিরকাল পথ-ভোলা। সে কি মিথ্যে?

না। শিব তুমি, যখন তুমি শান্ত; ভয়ভীষণ তুমি, যখন তুমি পথে নামবে অশান্ত হয়ে। কী দেখছ?

তোমাকে দেখছি। আকাশ যেমন পৃথিবীকে দেখে চোখ মেলে। চলো আমার সঙ্গে তুমি।

কী পাবো তোমার কাছে?—শিলি কহিল!

ভক্তের পূজোয় দেবী কি পান্? তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিলাভের আশায় উপকরণ সাজিয়ে রেখেছি প্রচুর!

প্রাণহীন, হৃদয়হীন উপকরণ! ওদের দাম কি? হাত ভ'রে তুমি দেবে, প্রাণ খুলে ত' দেবে না?

রমাপতি কহিল, প্রাণ খুলেই দেবো, দেবি।

শিলি কহিল, সেই প্রাণ তোমার কৃপণতায় ভরা, সেখানে তোমার জহুরীর ব্যবসায়ের হিসাব। তোমার দারিদ্র্য দেখে তখন আমার লজ্জা হবে! চাই চাই, কেবল আমি চাই। হাত পেতেও নেবো,

প্রাণ পেতেও নেবো, আমি যে মেয়ে! দিতে না পারলে তখন বাধবে সংঘাত, লক্ষ্মী হবে চঞ্চল। তুমি জানো দান করতে, দিতে জানো না।

কী তুমি চাও বলো?

উত্তপ্তকণ্ঠে শিলি বলিল, তরুণ সূর্যের কাছে দেবী কুন্তী কী চেয়েছিলেন মনে নেই তোমার? আলোর চেয়েও বড়, চেয়েছিলেন সূর্যের হৃদ্‌পিণ্ড, অগ্নির উৎস। থাক্ থাক্, যেতে দাও আমাকে। কিছু পাওয়ার চেয়ে কিছুই না পাওয়া ভালো। সরো, পথ ছাড়ো — বলিতে বলিতে শিলি উঠিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু কথা বাকি রইল যে তোমার সঙ্গে?

কী কথা?

রমাপতি কহিল, তোমাকে যেতে দেবো না!

দোকানের লোকজনের দিকে তাকাইয়া শিলি কহিল, মনে রেখো এটা তোমার নিভৃত শয়ন মন্দির নয়। আমার সম্ভ্রম বজায় রেখো।

এসো তবে আমার সঙ্গে।

দুইজনে বাহির হইয়া আসিল। একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, কখন্ ফিরবেন ছোটবাবু?

রমাপতি কহিল, বল্‌তে পারিনে, স্টোর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। রমাপতি উঠিয়া স্টিয়ারিঙ ধরিল, শিলি তাহার বাঁ দিকে বসিল। গাড়ি ছুটিল।

শিলি কহিল, তুমি আস্ত পাগল।

কিন্তু তুমি যে মাতাল!

মিছে কথা, মাতাল হয় পুরুষ, তারা মস্তিষ্কজীবি। আমরা জানি আনন্দকে, তারা জানে উপভোগ!—কোন্‌দিকে যাচ্ছি?

রমাপতি কহিল, নরকের দিকে।

শিলি কহিল, ভয় দেখিয়ো না আমাকে, আমি জানি তুমি

ব্যবসাদার। আমার অলঙ্কারের দাম থেকে পঁচিশটে টাকাও তুমি ছাড়োনি। নরকের পথে গেলে লোকসান, তাই তুমি যাবে না। তোমার চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা যদি বা থাকে, পাপ একটুও নেই।

তুমি জানো, তোমাকে ধ্বংস করতে পারি?

কোন্ অস্ত্র দিয়ে গো ঠাকুর, কে তুমি? তোমার রূপের মধ্যে পৌরুষ কোথায়? ওই চেহারা নিয়ে প্রেমিক কবির অভিনয় যদি বা জমে, শক্তিমানের অভিনয়ে পাস্-মার্কও রাখতে পারবে না। মনে করেছ তুমি আমি কাঁদতেই পারি, পারি বুঝি কেবল বিপদে তোমার পায়ে ধরতে? মনে করেছ বিলাসের সঙ্গিনী হয়ে দাসীবৃত্তি করতে চলেছি? ভুল, ভুল, দাহ্যবস্তুর মধ্যে আগুন ধরিয়েছ, ঘর পুড়বে তোমারই। তুমি প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু আমিও যে করালী কালী—নাচতে নাচতে যাবো তোমারই বুকের ওপর দিয়ে! চলো, চলো, নরকের পথেই চলো। দুজনেরই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা হোক।—শিলি তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

রমাপতি গাড়ি ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল, তোমার সেই রূপ আমি দেখবো। দেখবো তুমি কেমন সর্বনাশিনী!

শিলিও হাসিল। কহিল, দেখবে, তার আর দেরি নেই। বাহুবলের ভয় দেখিয়ো না, বলদর্পীর অত্যাচারে কণ্ঠরোধ করতে চেয়ো না, পায়ে আমার শৃঙ্খল দিয়ে শক্তির দম্ভে আমার পরে স্বেচ্ছাচার করো না,—আমি জাগতে জানি। মদমত্তের অন্যায়, লোভীর লোভ, আর শক্তের অবিচারে তুমি যখন আমার প্রাণের দিগদিগন্ত ঘন অন্ধকারে ঢেকে আনবে,—চঞ্চল হবো আমি, ধ্বংস করবো আমি। চলো, ভয় করিনে কিছু, গ্রাহ্য করিনে পুরুষত্বহীন পুরুষকে।

রমাপতি বলিল, এতই যদি জানো তবে আমার আকর্ষণে চলেছ কেন?

শিলি কহিল মেয়েলি কৌতূহল মানো? এও তাই। তোমাকে জান্‌তে চাই তোমার উপকরণের ভেতর দিয়ে। মেয়েমানুষ যে হিসেবী, পালিশটা বাদ দিয়ে তারা চায় সারতত্ত্ব। চলো।

রমাপতি বলিল, কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আছে বৈ কি, রাগ করো কেন? আগে জানা, তারপরে জানানো, আগে পাওয়া তারপরে দান,—আমি যে মেয়ে!

বড়বাজারের এক অন্ধকার গলির ভিতর সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ি, ঘোড়া, গোরু ও মানুষের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া এক জায়গায় গাড়ি আসিয়া থামিল। তুই জনে নামিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

সম্মুখে গুর্খা দারোয়ান বেয়নেট্‌ওয়ালা এক রাইফেল লইয়া দণ্ডায়মান, সেলাম করিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল। নীচেটা যেন ঘুট্‌ঘুটি অন্ধকার, অনেকগুলা অব্যবহৃত ঘর, পাথর-বাঁধানো উঠান, সঙ্কীর্ণ সিড়ি; কোথাও হাওয়া নাই, আলো নাই—কেবলমাত্র অনেক উঁচু হইতে আকাশের একটু সামান্য আলো নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই পাইপের জলটা চক্‌চক্ করিতেছিল। অন্ধকারে শিলি ঠাহর করিয়া দেখিল, নানা রঙের মোটা কাঁচের টুক্‌রা বসানো থামগুলি প্রেতের মতো দাঁড়াইয়া সহস্র চক্ষু দিয়া যেন ভয় দেখাইতেছে। চারিদিকে পুরাতন পাথরের গন্ধ; যেন কোন্ কঠিন শীতল পাতালপুরী, যেন জটিল গোলক ধাঁধাঁ। এই পাষাণ প্রাচীর ঘেরা বিভীষিকাময় কারাগারের গর্ভের মধ্যে আসিয়া শিলির বুকের ভিতরে তুরু তুরু করিতে লাগিল। এমন বাড়ী কলিকাতায় আছে ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে ভয়ে ভয়ে রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল।

রমাপতি কহিল, এই যে এই সিঁড়ি, এসো, কোনো ভয় নেই।

শিলি কহিল, ও কিসের শব্দ ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠ্‌ল?

ও হরি, ও যে টাকার শব্দ, পাশেই মাড়োয়ারির গদি।

আমি আর যাবো না।

কেন?

ভয় করে।

রমাপতি হাসিল বলিল, এ যে আমার বাড়ী, ভয় কি?

শিলি অন্ধকারে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। বলিল, তোমার চেহারাও বদ্‌লে গেছে এখানে এসে, তুমিও ভয়ঙ্কর।

তবে চলো ফিরে যাই।

না, যাবো না, শেষ ভয়টুকুও আমার কাটুক। বলিয়া সে আবার সেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বাহিয়া রমাপতির সহিত উপরে উঠিতে লাগিল।

রমাপতি কহিল, এই বাড়ীটা আগে ছিল এক মাড়োয়ারির, সে কেবল ঘরের পর ঘর বানিয়েছে, দালানও নেই, বারান্দাও নেই। ওরা বাগানও চায় না, অবকাশও চায় না,—ওরা চায় নিটোল নিরেট প্রাসাদ, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন! সাততলা গাঁথুনি, তার মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই। তারপরে এই প্রাসাদের কোন্ ঘরে পাওয়া গেল দুই রমণীর মৃতদেহ—

কী বল্‌ছ তুমি?—শিলির গা কাঁপিয়া উঠিল।

হ্যাঁ, মৃতদেহ, একজোড়া। তাদের আবার মাথা ছিল না। ছিন্নমস্তা!—তারপরে মোকদ্দমা, তারপরে তারা সর্বস্বান্ত!

শিলি কহিল, আর কত দূর?

রমাপতি কহিল, তিনতলা পার হয়েছি, পাঁচতলায় আমার ঘর।

চারতলায় উঠিয়া মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল। পাশেই একটা ঘর। ভিতর হইতে একজন সাড়া দিল। বলিল, কে?

রমাপতি পর্দা তুলিয়া হাসিল। সেই ফাঁকে দেখা গেল, আলো জ্বালিয়া কয়েকটা লোক চুপি চুপি তাস খেলিতেছে। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, কত হোলো জীবন দাস?

আজ্ঞে, প্রায় চার হাজার।

বটে? কালকের সাত শো তবে শোধ ক'রে দিয়ো। বলিয়া সে আবার উপরে উঠিতে লাগিল।

শিলি কহিল, কী হচ্ছে, ওখানে?

ও কিছু না, এক রকমের জুয়া। ওর নাম ফ্লাশ। লুকিয়ে খেলতে হয়।

কেন?

সে আর ব'লো না, পুলিশ বেটাদের জন্য আজকাল—এসো, এই আমার ঘর।—নন্দা সিং?

হুজোর! বলিয়া কোথা হইতে দৈত্যের মতো একজন হাফ প্যাণ্ট পরা নেপালী আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি তাহার হাতে একগোছা চাবি দিয়া কহিল, খুলো।

এই আমার ঘর! হ্যাঁ, অনেক বড়, হল্‌ঘরের মতন! কী দেখ্‌ছ? অন্ধকার খুব মনে হচ্ছে?

শিলি কহিল, তোমার আত্মীয়স্বজন?

রমাপতি হা হা করিয়া হাসিল। বলিল, ও সব বালাই নেই। ওদিকের বারান্দার সব খালি, কেনবার পর থেকে আজো খুলে দেখিনি, সেগুলোর মধ্যে কি আছে! ভয় পাও কেন শিলি?

কা'রা দাঁড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে? কড়িকাঠের নীচে ওসব কী?

আরে, পাগল তুমি। ওগুলো সব মেহগণি কাঠের আসবাব, ওরা প্রেত নয়! ওদের মাথায় সোনা-রূপোর বাসন, অন্ধকারে বুঝি দেখতে পাচ্ছ না?—এই নাও। বলিয়া রমাপতি আলোটা জ্বালিয়া দিল।

শিলি কহিল, মানুষ নেই কোথাও এদিকে?

আছে বৈ কি, এটা বড়বাজার, অহোরাত্র এখানে মানুষ। বাইরে এখনো আছে দুপুর বেলাকার আলো, অবশ্য এখানে আলো আসতে পারছে না।

শিলি একটা চৌকীতে বসিল। চারিদিকে ঠাসা জিনিসপত্র; অযত্নে ধূলায় লুটানো জরির বাণ্ডিল, একদিকে লাল মখমলের সজ্জা, রেশম ও সাটিনের পরিচ্ছদ, শ্বেতপাথরের আসবাব, তারপর সোনা-রূপা, তারপর পিতল কাঁসা, তারপর ছবি আর ঘড়ি, বিচিত্র বিপুল ও বিস্ময়কর এই রহস্যলোক। মেঝে দেখা যায় না, কোমল রঙিন বহুবিচিত্র কার্পেটে মোড়া, তাহারই উপর ছড়ানো নানা রকম কাঠ ও পাথরের জিনিসপত্র, পা বাড়াইবার উপায় নাই। ঘরের ভিতরে সহস্র সহস্র টাকার সাজ-আসবাব যেন কতকাল হইতে এই অন্ধপুরীর মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন কবরের মৃত্তিকার নীচে বন্দিনী প্রেতিনীর দল দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

রমাপতি কহিল, এসো এদিকে—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শিলি তাহার দিকে সরিয়া গেল, আর যেন তাহার নিজের সত্তা বলিয়া কিছু নাই। রমাপতি তাহার দুই হাত ধরিয়া হাসিল। অন্ধকারে তাহার মুক্তার মতো দাঁতগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। শিলি কম্পিতকণ্ঠে কহিল, কী চাও তুমি?

এর ওপর বসো। ভয় কি? এটা একটা সিংহাসন, ব্রোন্‌জের তৈরী।—বলিয়া সে শিলিকে কি একটা ধাতু-নির্মিত উঁচু আসনের উপর বসাইয়া দিল, তারপর সরিয়া গিয়া সুইচ্‌ টিপিয়া একটা বড় আলো জ্বালিল। সেই আলোয় বিরাটকায় এক লোহার আল্‌মারী খুলিতেই ভিতর হইতে বিচিত্র জহরের সম্ভার ঝলমল করিয়া উঠিল। তাহাদেরই প্রতিবিম্বিত আলো দূরে গিয়া পড়িল শিলির মুখে চোখে।

একে একে রমাপতি জড়োয়া জহরের অলঙ্কার বাহির করিয়া আনিল। শিলি কহিল, কি করবে ওগুলো?

তোমাকে দেবো।

আমার কী হবে? আবার তুমি ঐশ্বর্য দেখাতে চাও?

রমাপতি কহিল, আমি দেখতে চাই তোমার পরিপূর্ণ রূপ!

তুমি কি এম্‌নি করেই সর্বস্বান্ত হবার অভিনয় করবে?

সর্বস্বান্ত হ'তে আমার বাকি নেই শিলি। সাত লক্ষ টাকা কোম্পানীর দেনা, এই বাড়ী বাঁধা দেওয়া, বিলেতের এক জহুরী আমাদের নামে নালিশ করেছে,—ডুবতে আমাদের আর দেরি নেই। সুনাম, প্রতিপত্তি, কারবার—সমস্তই যাবে। তবু আমার এই শেষ দান তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, দেবি।—এই বলিয়া সে শিলির মাথায় এক মুক্তার মুকুট পরাইয়া দিল।

শিলি কহিল, তুমি জানো আমার বিবাহ আসন্ন? জানো দ্বিতীয় কোনো পুরুষের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অনেক বড় পাপ?

জানি। এও জানি তুমি আমার জীবন মরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! কোথা যাবে তুমি আমাকে ছেড়ে?—বলিয়া রমাপতি তাহার মাথার চুলে গাঁথিয়া একটি হীরাখচিত টায়রা পরাইয়া দিল।

তুমি কি কিছুই মানো না? বিপ্লবকেও ভয় করো না?

না।

আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ? বিয়ে করবে আমাকে?

না! ওটা নোংরামি, বিয়েটা হচ্ছে পুরুষের পদস্খলন!

তবে? তবে তুমি কী চাও, রাক্ষস?—শিলি চীৎকার করিয়া উঠিল।

তোমাকে পূজা করব। আমার কল্পলতা, তোমার নাচের তালে তালে উঠ্‌বে আমার বুকের রক্ত দোল খেয়ে, ছন্দে ছন্দে চল্‌বে আমার উন্মত্ত প্রাণের স্পন্দন। না, না, লজ্জা ক'রো না আজ, বাধা দিয়ো না আমার দুরন্ত উল্লাসকে—

তাহাকে বাধা দিতে গিয়া শিলি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, পায়ে পড়ি তোমার···না, কিছুতেই না, বাঁচাও আমাকে, আমাকে বাঁচাও তুমি—আমি ভদ্রঘরের মেয়ে—

রমাপতি বাধা মনিল না, আপন শক্তিতে সে নিজের কাজ করিয়া গেল। তারপর একটি সুন্দর সাতলহরী মুক্তার মালা তাহার গলায় পরাইয়া বলিল, জানি, এর পরে আরো অলঙ্কার পরাবো, তুমি আরো দেবে বাধা। কিন্তু বাধা ত আমি মান্‌বো না, শিলি! নাও, উঠে দাঁড়াও।

শিলি ভয় পাইয়া কহিল, আবার? এর পরেও অপমান করতে চাও?

না। তোমার রূপের মূল্য দিতে চাই। সেই চোখ দিয়ে তোমাকে দেখবো, যে চোখে মহাকবি দেখেন নন্দনবাসিনী উর্বশীকে!

কবির চোখ পেয়েছ, রুচি আর মন ত' নেই তোমার?

তাই ব'লে দেখার সাধ কি অপূর্ণ থাকবে? শুধু দেখা নয়, অলঙ্কৃত করবো তোমার সর্বাঙ্গ। সেই স্বপ্ন আমার মিথ্যা ক'রে দিয়ো না, শিলি?

বেশ, তবে স্পর্শ করো না আমাকে। দাও অলঙ্কার, নিজে আমি পরবো।—হীরা ও মুক্তার নানা অলঙ্কার লইয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করিয়া শিলি একটি একটি করিয়া তাহার দুইখানি পা পর্যন্ত পরিয়া লইল।

দাঁড়াও সোজা হয়ে এইবার?

শিলি দাঁড়াইল স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি লইয়া। চোখে তাহার সেই অহঙ্কার, যে অহঙ্কারে সামান্য মেয়ে পুরুষের নিকট মহীয়সী হইয়া উঠে! সেই রূপ নারীর নয়, বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির। তাহার চোখে অশ্রু শুকাইয়া গেল, অধরে তাহার কঠিন প্রতিজ্ঞার আভাস,—ললাটে দৃঢ়তা, দুই হাতে শক্তি, অকম্পিত বক্ষ, দুই পায়ে অজেয় সাহস!

কিয়ৎক্ষণ পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রমাপতি মাথা হেঁট করিল, তারপর সহসা নীচের সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ পাইয়া দ্রুত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

শিলি ভাবিল, এ কেমন মানুষ! কোন্ রহস্যপুরীতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া কী অসাধ্য সাধন করিতেছে? ইহার সংসার নাই, আত্মীয়বন্ধু নাই, জীবনের কোনো শৃঙ্খলা নাই! আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন, —মনে না লোকাচার, জানে না ভয়। সজ্ঞানে চলিয়াছে সর্বনাশের দিকে, ইহার ভরাডুবি হইতে আর বিলম্ব নাই,—শিরার রক্তের মধ্যে ধ্বংস ও উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! পাপ-পুণ্য ইহাকে স্পর্শ করে না, নীতি ও দুর্নীতির সংস্কার ইহার কাছে হাসির বস্তু, ন্যায় ও অন্যায় ইহার নিকট ছেলেখেলা! শিলির মনে হইল, নিষ্ঠুর তান্ত্রিকের মতো রমাপতি যেন অনির্বাণ হোমকুণ্ড জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, জীবন ভরিয়া এক দীর্ঘ যজ্ঞ করিয়া চলিয়াছে, তাহার সেই আগুনে পুড়াইবার জন্য পথের মানুষকে সে ধরিয়া আনে!

শিলি ভাবিল, ইহারই কি নাম প্রতিভা? মহৎ মানুষ নয়, নীচ চরিত্র নয়, কিন্তু বিচিত্র মানুষ! যেন এক বিরাট প্রতিভা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এই পাষাণ-পুরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানের আলো ইহার চোখে নাই কিন্তু ইহার বুভুক্ষু আত্মার সর্বনাশা আগুন হা হা করিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছে। ইহারই কি নাম শিল্প? ইহারই কি নাম জহুরী? যাহাকে উন্মাদের মতো কাছে টানিয়া আনে তাহার আকণ্ঠ কেবল গরলেই ভরাইয়া দেয়? কে ইহাকে ভালো-বাসিবে? কোন্ মেয়ে ইহাকে বিবাহ করিয়া নিজের জীবনে সর্বনাশের আগুন জ্বালাইতে চাহিবে? ইহার অবিরাম বহ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলে ইহার উজ্জ্বল লোল জিহ্বা কেবলই যে দীর্ঘতর হইতে থাকিবে।

বাহিরে কয়েকজন পুরুষের গলার আওয়াজ পাইয়া শিলি ভীত দৃষ্টিতে তাকাইল।

কাহারা যেন চাপা কণ্ঠে আলোচনা করিতেছে। কী যেন একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র! এখান হইতে পলাইবার আর কোনো পথ নাই।

চিরদিন এই অন্ধকূপে বন্দী হইয়া থাকিলেও কেহ জানিবে না, চীৎকার করিলে কোথাও সাড়া পৌছিবে না। যে দুইটি রমণীর মৃতদেহ এই প্রাসাদের এক কক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহারাই কি তাহাদের মৃত্যুর জন্ম দায়ী? এই হত্যাশালায় যে কেহ আসিলেই কি তাহাকে প্রাণ দিতে হয়? মুণিমুক্তার স্তূপের ভিতরে কি তাহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে? সাতলহরী মালার ফাঁসীতে লট্‌কাইয়া কি তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লয়?

হাসির আওয়াজ আসিল। যেন প্রেতের অট্ট অট্ট হাসি, যেন শিকার মিলিয়াছে, যেন হিংস্র শ্বাপদের গুহায় মানুষ পড়িয়াছে। কিন্তু শিলি কান পাতিয়া শুনিল,—না, হাসি নয়, পুরুষের কান্নার শব্দ! পুরুষ কাঁদিল কেন? কে কাহার বুক দিল ভাঙিয়া? তবে কি এই পাষাণের ফলকে ফলকে পুরুষের কান্নাও জমা আছে? তবে কি পুরুষের নিঠুরতা পুরুষকেও ক্ষমা করে না?

কিয়ৎক্ষণ পরে কোলাহল শান্ত হইলে এক সময় রমাপতি আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। দেখিল, মাথায় মুকুট ও গলায় মুক্তার মালা পরিয়া শিলি সিংহাসনের উপর নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিল। বলিল, কে ওরা? কেন কাঁদছিল?

রমাপতি বলিল, ওরা আমার অনুচর। আর একটা কারবার ফাঁদছি, ওদের মোতায়েন করেছি সেই কাজে।

কিসের কারবার?

রমাপতি আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল। কহিল, শুন্‌তে চাও? কিন্তু বিশ্বাস ক'রে বলছি তোমাকে। এই জহরতের ব্যবসা যেদিন যাবে লিকুইডেশনে, এ-কাজ সেদিনকার ভরসা। উত্তর কল্‌কাতার প্রান্তে এক জঙ্গলে কিছু জমি লিজ্‌ নিয়েছি। সেখানে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সেই বাড়ীর নীচে মাটির তলায় সুড়ঙ্গের পথে মদ চোলাই করব, বিলেতি

লেবেল্ দিয়ে বিক্রী করব বাজারে। মানে, লিমিটেড্ কোম্পানী! দুজন মাড়োয়ারী, তিনজন ইহুদী, দুজন সাহেব, আর এই অধম।

এই জোচ্চুরি যেদিন পুলিশে ধরা পড়বে?—শিলি কহিল?

রমাপতি হাসিল। কহিল, লাখ কয়েক টাকা লাভ করবার আগে ধরা পড়বো না, এমন ব্যবস্থা করা আছে, শিলি!

শিলি কাঠ হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি মদ খাও?

খাইনে, লোককে খাওয়াই! নির্বোধদের খাইয়ে কাজ আদায় ক'রে নিই!—বলিয়া রমাপতি পাণ ও সুর্তি চিবাইতে লাগিল। পুনরায় কহিল, জীবনে কোনো নেশাই আমি করিনি।

ওরা কাঁদছিল কেন তোমার কাছে?

আর ব'লো না। বেচারি মূলচাঁদ! আমার কাছে হ্যাণ্ড্নোটে টাকা ধার নিয়ে ধরেছিল একটা ঘোড়াকে—মানে, ঘোড়দৌড়ের কথা বল্ছি, ঘোড়াটা টক্কর খেয়ে হেরে গেল। লাখ চারেক টাকা লোকসান।

তুমি জুয়া খেলো?

মূলচাঁদ যে আমার চেয়েও বড় জুয়াড়ী! কিন্তু গেল আমারই টাকা, ও বেচারিকে ত আর জেলে দিতে পারিনে। আমারই কাছে সন্ধান পেয়ে ওই ঘোড়াটা ও ধরে। তাই কাঁদছিল আমার কাছে এসে। ওর কান্না দেখে হেসে বাঁচিনে। বুকের ছাতি ছোট কিনা।

শিলি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সকলের চেয়ে তুমি ভয়ঙ্কর, কিন্তু কেন চলেছ এই ধ্বংসের রথ দিয়ে? কেন আয়োজন করছ তোমার ভীষণ সর্বনাশের? কী আনন্দে তুমি মাতলে?

খেয়ালের খেলা! —বলিয়া রমাপতি হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, কী সুন্দর তুমি, ললাটের মুকুটে তোমার লক্ষ তারকা জ্বল্ছে, কণ্ঠে তোমার মুক্তার সমুদ্রের সাতটি লহর, তোমার নয়নে আর

চরণে আর যৌবনে আমার চিরমরণ, তোমার দুই বক্ষে আমার সৃষ্টি আর ধ্বংস—কী রূপ তোমার? মধুর পাত্রে জড়িয়ে গেল মধুমক্ষিকার পাখা!—সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিলিও ভুলিয়া গেল ভয়, ভুলিয়া গেল বিপদ, ভুলিয়া গেল এই কারাগারের বিভীষিকা। মোহাবিষ্ট হইয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, দুরন্ত তুমি, তুমি ভয়ঙ্কর, তোমার উৎপীড়নের দুর্গম পথ পার হয়েও তোমাকে কেন যে ভালো লাগে! বিশ্বজয়ী তোমার রূপ, অনন্ত তোমার যৌবন—অথচ রুদ্রের মতন তুমি অশান্ত—বলিতে বলিতে তাহার গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সিংহাসন হইতে নামিয়া দুই হাতে রমাপতিকে ধরিয়া তাহার বুকের ভিতর মুখ লুকাইয়া সে পুনরায় কহিল, তোমাকে নিতে পারবো না, তোমাকে দিতেও পারব না। আমি মেয়েমানুষ, নিভৃত নিশ্চিন্ত ঘরই আমার প্রিয়. নীতি আর শৃঙ্খলায় আমার সঙ্কীর্ণ জীবন-ধারা বইতে চায়। ওগো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

রমাপতি কহিল, আর ভালোবাসা?

না, না, কিছু নয়। ও তোমার জন্যে নয়, ওর দিকে তুমি চেয়ো না। তুমি থাকো মরুভূমি নিয়ে, সমুদ্র নিয়ে, অভিসম্পাৎ নিয়ে। আমাকে যেতে দাও লোকালয়ে, স্নেহ-ভালোবাসা-মমতার স্নিগ্ধ ছায়ায়। আমি গ্রামের নদী,—ওগো, আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

মাথায় মুকুট পরিয়া শিলি রমাপতির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। রমাপতি তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া দাঁড় করাইতেই সে পুনরায় কহিল, পাপপুণ্যের বোধ তোমার নেই, তাই তুমি এত বড়। দুষ্কৃতির পথ দিয়েই তুমি একদিন পাবে তাঁকে, যাঁকে আমরা বলি পরমেশ্বর! তোমার সকল অন্যায় আর দুর্নীতি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবে গৌরবের মুকুট।

বলো তুমি নেবে এই মুকুট, এই মুক্তোর মালা, এই সমস্ত জহরৎ?

শিলি দুই হাত পাতিয়া বলিল, দাও, সব দাও, যা কিছু তোমার ঐশ্বর্য আজ আমি মাথায় তুলে নিয়ে যাবো! তোমার দান প্রাণ পেতে নিলুম কিন্তু আমি কী দিতে পারি। আমি যে বড় দরিদ্র!—বলিয়া সে তাহার উৎসুক সুন্দর মুখ রমাপতির দিকে তুলিয়া ধরিল।

বাহির হইতে নন্দা সিং সাড়া দিল, হুজোর!

হাঁ।

এক সাহেব আয়া। ব্রড্‌লি উন্‌কা নাম।

আনন্দে দপ্‌ করিয়া রমাপতি জ্বলিয়া উঠিল। লাফাইয়া হাসিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে, কাজ হাসিল হয়েছে! শিলি, রাজ্য জয় করেছি, একটু বসো তুমি, একটু, সব বল্‌ব তোমাকে—এখুনি আসছি। ওই—ওই এসেছে ব্রাড্‌লি—

তাহার হাত ধরিয়া শিলি কহিল, কখন্ আসবে? দিলে না যা চাইলুম?

তাহার চিবুকে হাত দিয়া রমাপতি বলিল, নিবিড় ক'রে এঁকে দেবো। আসছি এখুনি।—বলিয়া পাশের দরজা দিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মনে হইল নন্দা সিংও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। নিস্তব্ধ নির্জন বাড়ীর ভিতরে দুই জনের নাল-বাঁধানো জুতার খট্ খট্ শব্দ দূর হইতে দূরে যেন কোন্ অতল তলে একটু একটু করিয়া মিলাইয়া গেল। শিলি তাহার উৎসুক চুম্বন-তৃষ্ণা লইয়া বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা পিছন দিক হইতে লঘু পদশব্দ শুনিয়া সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। দেখিল একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক তাহার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিজেকে সম্বরণ করিয়া শিলি তাহার কাছে সরিয়া আসিল। আলোয় দেখা গেল, তাহার সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন। তাহার চোখে মুখে উত্তেজনা।

সে কহিল, কে ভাই তুমি? তোমাকে যেন চিনি মনে হচ্ছে?

মেয়েটি কহিল, চেনো?

হ্যাঁ, চিনেছি; একটু আগে তোমাকে এদের দোকানে দেখে এলুম, তাই না? তোমার নাম কি?

সবিতা। তুমি কেন এসেছ এখানে?

শিলি কহিল, এনেছেন আমাকে রমাপতিবাবু। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসবেন তিনি।

তাহার কপালে মুকুট, গলায় মালা, এবং তাহার বিস্ময়কর রূপ-রাশির দিকে তাকাইয়া সবিতা হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, কেন এলে তুমি আমার সর্বনাশ করতে? আমার যে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই?

কী বল্‌ছ ভাই?

সবিতা চীৎকার করিল, নিজের মাথার চুল দুই মুঠায় টানিতে টানিতে কাঁদিয়া বলিল, আমি যে স্বামীকে ছেড়েছি ওর জন্যে! আমি যে জলাঞ্জলি দিয়েছি আমার সংসার! তোমার সহ্য হোলো না, এলে রাক্ষসীর মতন ওকে গ্রাস করতে?

তাহার চীৎকারে সেই পাষাণের কারাগার বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শিলি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে একবার তাকাইল, কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ইহাকে থামাইবার সাহস নাই, সান্ত্বনা দিবার ভাষাও নাই।

সবিতা কহিল, ডাকিনী, কেন এসেছিস? পরের সুখ সহ্য হোলো না। পরের ভালো দেখে তোর বুক ফাট্‌ল?

শিলি কহিল, কেন ভাই রাগ করছ?

সবিতার যেন কোন্ ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছিল। উন্মত্তকণ্ঠে সে বলিল, দূর হয়ে যা, চুলোয় যা,—এত হিংসে? এত পরশ্রীকাতরতা?

শিলি কহিল, আচ্ছা যাচ্ছি, চেচিয়ো না তুমি !

সবিতা তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল। বলিল, ঠিক যাবে ?

হ্যাঁ ঠিক যাবো, তুমি কেঁদোনা।

আর আসবে না ?

শিলি কঠিন কণ্ঠে কহিল, কোনোদিন আসবো না, কোনো দিন আর তোমার রমাপতিকে দেখা দেবো না। যাচ্ছি আমি।

ঘন কালো মেঘের ভিতর দিয়া আলো ফুটিয়া উঠিল। সবিতা কহিল, বাঁচলুম, কী যে ভয় হয়েছিল তোমাকে দেখে! জানো ত' পুরুষের মন, হয়ত তোমাকে দেখে ওর মন টলতে পারে, হয়ত এর পরে আমাকে অবহেলা করবে—বুঝলে না ? তুমি কুমারী তোমার রূপ আছে, তাই ত' আমার ভয়!

শিলি হাসিল। বলিল, সে ভয় তোমার নেই, নিশ্চিন্ত থাকো তুমি। কতদিন তোমার সঙ্গে রমাপতির আলাপ ?

এই আজ তেরো দিন হোলো।

ও, মাত্র তেরো দিন !

সবিতা বক্র বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আত্মীয় যে হয় তেরো মিনিটেই হয়। আমার এক মাসতুতো বোন গলায় দড়ি দিলে ওর জন্যে, তবু পেলে না। ও যে আমার, ওকে নেবে কে ?

শিলি কহিল, কিন্তু তোমার স্বামী ত আছেন !

আছেন বৈ কি, একটি কোলের ছেলে—আর একটিও—বলিয়া সবিতা নিজের দেহের দিকে তাকাইল।

শিলি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, সে কি, সন্তানের মা তুমি! ছি, এমন কাজ করতে নেই, তুমি অত্যন্ত বিপদে পড়বে,—এরা উচ্ছৃঙ্খল মানুষ, এদের মোহে আচ্ছন্ন হ'তে নেই। তুমি ঘরে ফিরে যাও ভাই ?

দেখিতে দেখিতে সবিতার মুখ আবার বিকৃত হইয়া উঠিল। কুৎসিত

ভঙ্গী করিয়া কহিল, ভাঙিয়ে নিতে চাও, কেমন? মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাসিল্ করতে চাও! বড়লোক দেখেই বুঝি তোমার এই লোভ? এত লালসা তোমার, এমন জঘন্য প্রবৃত্তি জানোয়ারের মতন? কেন, দেশে আর পুরুষ নেই? আমার খাবার ছোঁ মারতে এসেছ, ভয় নেই কালীঘাটের কুকুর হবার? দূর, দূর, দূর হয়ে যাও! হিংসার চেহারা দেখিয়ে নষ্ট করতে চাও ত্যাগের যজ্ঞকে! জানোয়ারের দেহ-লালসা দিয়ে জয় করতে চাও প্রেমের ঠাকুরকে? ওরে পথের কুকুর!

শিলি তাহার গলায় হাত রাখিয়া স্নেহের হাসি হাসিল। বলিল, যাচ্ছি, ভাই, তোমার উত্তেজনা শান্ত করো। এই নাও—বলিয়া নিজের মাথার মুকুট লইয়া সে সবিতার মাথায় পরাইয়া দিল, গলার মুক্তার মালা খুলিয়া তাহার গলায় পরাইল, আংটিটা দিল তাহার আঙুলে। তারপর পুনরায় বলিল, সব নাও, আমি কিছুই নিতে আসিনি। যদি এই অলঙ্কার ধারণ ক'রে রাখতে পারো তবে দূরে থেকে আমি সুখী হবো। ভগবান যেন তোমাকে সকল বিপদ থেকে মুক্তি দেন। আচ্ছা ভাই, এই তোমার সঙ্গে প্রথম আর শেষ দেখা। আমাকে মার্জনা ক'রো।—বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে বাহির হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিল।

পথের উপরে ঝাপ দিয়া সে আলো দেখিতে পাইল,—বিকালের সুন্দর উজ্জ্বল আলো; মানুষ দেখিল,—দ্রুত ধাবমান অপরূপ বিচিত্র মানুষ; ট্রাম, মোটর, গরুর গাড়ি, ঘোড়া, দোকান, পথের পর পথ। বাতাস লাগিল তাহার মুখে-চোখে, তাহার প্রাণে-মনে। বুক ভরিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস লইল। তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল কিন্তু প্রেতলোকের জটিল জাল ভিন্ন করিয়া সে পুনরায় জীবন লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। নূতন পৃথিবীতে সে আবার আসিয়া নামিল। এবার সে কোন্ দিকে

যাইবে? কোন্ পথ দিয়া কোন্ পথে! সকল পথ তাহার হারাইয়াছে। যেন স্মৃতিবিভ্রম! যেন পূর্বজন্মের আর কিছুই তাহার মনে পড়িতেছে না।

লোকযাত্রার ভিতর দিয়া খানিকক্ষণ সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। মানুষের ভাষা সে যেন ভুলিয়া গেছে,—সেই প্রেতলোকের হাওয়া এখনও তাহার গায়ে জড়ানো, তাহার পরিচ্ছদের পাটে পাটে এখনও সেই বিভীষিকা।

একখানা ট্যাক্‌সি যাইতেছিল, হাত বাড়াইয়া তাহাকে থামাইয়া শিলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, ভবানীপুর।

এইবার সে নিশ্বাস ফেলিল। অদ্ভুত মদিরার নেশায় তাহার চোখে দেখিতে দেখিতে তন্দ্রা নামিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু চোখ বুজিতে তাহার সাহস নাই! চোখ বুজিলেই সেই অন্ধকার, সেই দুঃস্বপ্ন!

*

* *

প্রজাপতির পাখা রঙীন হইয়া উঠিল। কয়েকদিন আগে পাকা দেখা হইয়া গেছে। আজ বিবাহ।

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, পরিচিত, ইতর ভদ্র,—কেহ আর বাদ গেল না। সকাল হইতে সানাই বসিয়াছে। নিতান্তই প্রচলিত বিবাহ।

তা হোক, নূতন বৈচিত্র্য বড় বিপদ আনে। অতঃপর সমান বাঁধা রাস্তা।—পাত্রটি ভালো। শিক্ষিত, সভ্য, বিনয়ী, সদালাপী, বিলাত ফেরৎ। বিষয়ী তাহার মন, বিচার-বিবেচনায় তাহার খ্যাতি, প্রেমিক পুরুষ। তাহার রূপ আছে, গুণ আছে, শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ আছে। এই ভালো। নিশ্চিন্তে গৃহধর্ম পালন করার পক্ষে এই সৎপাত্রই কাজে লাগে।

বর আসিল। বাজনা, বাদ্য, শঙ্খ, হুলুধ্বনি, পুষ্প বর্ষণ, আলো, হাসি, আদর-আপ্যায়ন। উভয় পক্ষে সামাজিক সৌজন্য, কুটুম্বিতা, গাল-গল্প রসিকতা। তারপর লুচি, সন্দেশ, দধি। যথারীতি স্ত্রী-আচার, ছাদ্‌নাতলা, সম্প্রদান। পরিশেষে বাসর ঘর। অর্থাৎ মসৃণ, নিখুৎ নির্ভুল পথ।

পরদিন বর বিদায়। হাসির পরে অশ্রু। প্রতিমা বিসর্জন। নবপরিণীতার কনকাঞ্জলী, অর্থাৎ, তোমাদের ভাত-কাপড়ের ঋণ শোধ করিয়া গেলাম। শানাই জোরে বাজিল। গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। গাটছড়া-বাঁধা স্বামী-স্ত্রী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সকলে গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সবাই কাঁদিয়া আকুল। জিনিস-পত্র উঠিতেছে। এমন সময় ভিড়ের ভিতর হইতে ছোটপিসি পথ কাটিয়া গাড়ীর দরজার কাছে আসিল।

ভিতরে শিলি ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, কোনোদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তাহার শূন্য দৃষ্টিটা আত্মগত। কুশণ্ডিকা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার মাথায় সিঁথি ও রুক্ষ কেশরাশি সিঁদুরে রাঙা। সুন্দর নববধূর বেশভূষা তাহার। গতকালের কুমারী শিলির সহিত আজিকার বধূ শেফালিকার আকাশ পাতাল প্রভেদ। পাশেই তাহার স্বামী, তাহার পরমগুরু। ছোটপিসি কাঁদিয়া তাহার হাত ধরিল।

যেন কোথা দিয়া কি ঘটিয়া যাইতেছে, যেন কিছু মনে নাই, ইহাই তাহার নিয়তি। ইহাতে সুখও নাই, ইহা যেন অবশ্যম্ভাবী! বিবাহ-ব্যাপারটার প্রয়োজন নারীর সুবিধার জন্য।

গাড়ি ছাড়িবার আগে ছোটপিসি আঁচল খুলিয়া সেই বহুমূল্য মুক্তার মালা বাহির করিল, তারপর তাহা শিলির গলায় পরাইয়া দিয়া কহিল, এই আমার আশীর্বাদ। এই মালা যেন তোর গলায় থাকে চিরদিন।

শিলি কথা কহিল না, কেবল তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। হয়ত সে ভাবিতেছিল, আবার সেই মুক্তার মালা! তবে কি অভিশপ্ত এই মুক্তার হলাহল চিরদিনই তাহার কণ্ঠের গোড়ায় লাগিয়া থাকিবে?

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।